অজয়কুমার

অজয়কুমার

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

দিগন্ত পাব্লিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯ থেকে অজিত দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
৬ই আশ্বিন, ১৩৫৬

এক টাকা আট আনা

প্রচ্ছদপট - শ্রীসূর্য্য রায়
ছবি - শ্রীকরুণা সাহা

মুদ্রণ - নিরঞ্জন দাসগুপ্ত, ব্লু প্রিণ্ট প্রেস,
৫নং, শ্যামানন্দ রোড, কলিকাতা
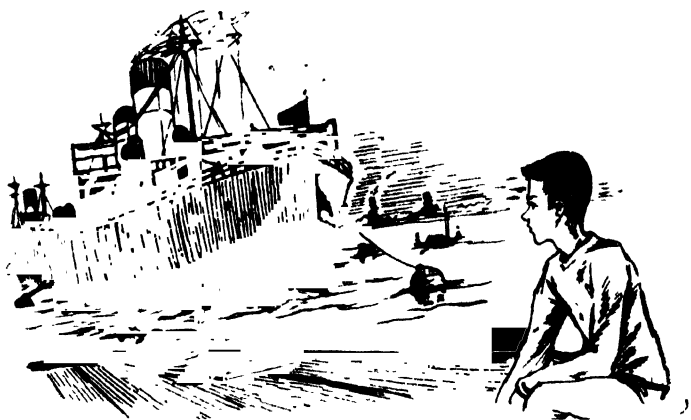
গৌরবর্ণ, পাৎলা ছিপছিপে চেহারা, যেন আগুনের ফোয়ারা ; বয়সের চেয়ে মাথায় লম্বা, দেখলে মনে হয় ষোল কি সতের, কিন্তু তার সত্যি বয়স চোদ্দ হবে ; চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, বুদ্ধিতে ভরা, তার মধ্যে দুষ্টামি বুদ্ধিও কিছু আছে ; কিন্তু মুখখানি একটু মলিন, দেখলে মনে হয় যেন বড় দুঃখী, মনে যেন কি বেদনা আছে। মা তার নাম দিয়েছিলেন অজয়কুমার, জীবনযুদ্ধে সে অজেয় হবে এই হয় ত তাঁর মনের ইচ্ছা ছিল। অজয় মানে ত অগ্নিও হয়, হ্যাঁ, আগুনের মত একটা জ্বালা সে তার বুকে অনুভব করে ; মা যদি থাকতেন, বাবাও যদি থাকতেন, তাহলে হয়ত সে এ অশান্তি অনুভব করত না, কিন্তু মামার বাড়ীতে আর তার থাকতে ভাল লাগে না।

মাকে তার খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে ; শুধু মনে পড়ে একদিন বিকেল বেলা সহসা আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল, চারিদিক ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল, তার কেমন ভয় হ'ল, ইচ্ছে হ'ল মায়ের কাছে ছুটে যায়, কিন্তু মেঘের ঘনঘটা দেখতেও কেমন একটা আনন্দ বোধ হচ্ছিল ; এমন সময় তার মা সিঁড়ি দিয়ে ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। আর একদিন, দুপুরবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে, সোঁ সোঁ ক'রে বাতাস বইছে, চারিদিকে হুড়দাড় কি শব্দ হচ্ছে! সে ডেকে উঠল, মা! মা ছুটে এসে তাকে ধ'রে ছাদের সামনে নিয়ে গেলেন, ছাদে বড় বড় ফোঁটায় বিষ্টি পড়ছে আর তার সঙ্গে সাদা সাদা বরফের টুকরো। সে অবাক হয়ে বল্লে, ও কি মা? মা বল্লেন, শিল পড়ছে দেখ খোকা! তারপর মা'তে ছেলেতে কি ধুম ক'রে শিল তুলেছিল, শিল খেয়েছিল ; চারটে বড় বড় শিল সে বাবার জন্যে রেখেছিল, কিন্তু বাবা এত দেরি ক'রে এলেন যে তখন সব জল হয়ে গেছে।

মা যখন চ'লে গেলেন তখন তার বয়স সাত বছর হবে, তার কিছুদিন পরে বাবাও চ'লে গেলেন। কোথায়? লোকে বলে স্বর্গে, যেখান থেকে কেউ না কি আর ফিরে আসতে পারে না। কোথায়, কোন্ দিকে তার পথ?

সন্ধ্যেবেলায় কলিকাতার গঙ্গার ধারে এক জেটির পাশে ব'সে অজয় এই সব কথা ভাবছিল। সামনে একটা বড়

জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে, মালপত্র তোলা শেষ হয়েছে, বড় বড় ক্রেনগুলো বকের মত গলা বাড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে ; ওপারে গোধূলির আলোর সঙ্গে ধোঁয়া মিশে একটা ভয়ঙ্কর রং হয়েছে, তার উপর কলের চিমনিগুলো কালো সঙীনের মত উঁচু হয়ে আছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বেশী দেরি করলে দিদিমা ভাববেন, কিন্তু অজয়ের উঠতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। স্কুল থেকে সে আর বাড়ী ফেরেনি, ম্যাচ্ দেখতে গড়ের মাঠে এসেছিল ; ম্যাচ্ দেখতে ভাল লাগল না, তাই গঙ্গার ধারে এসে বসেছিল। গঙ্গায় বড় বড় জাহাজগুলো দেখতে তার বড় ভাল লাগে, তারা যেন তাকে ডাকে, তাকে ভুলিয়ে নিয়ে আসে। সামনের নোঙর-ফেলা বড় জাহাজটির দিকে সে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল, জাহাজটি কত দেশদেশান্তরে, কত বন্দরে ঘুরেছে, কত সমুদ্র পার হয়েছে, পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছে। ওই রকম একটা জাহাজে ক'রে পৃথিবী ঘুরতে, বাহির হয়ে পড়তে সে চায়।

জাহাজের ডেকে দু'টি ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি খেলা করছে। মেয়েটির বয়স সাত-আট হবে, আর ছেলেটি অজয়ের সমবয়সী। লাল ফ্রক-পরা খুকীটির মাথার চুলগুলি সোনালী রঙের, কি মজার চুলের রং ; তাদের কলহাস্য স্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। অজয়ের বড় একলা বোধ হ'ল, তার নিজের কোন ছোট বোন নেই।

লুকোচুরি খেলা চলেছে। ছেলেটি কোথায় লুকাল মেয়েটি খুঁজছে, খুঁজে পেয়েছে ; তাদের হাস্যে, চীৎকারে সন্ধ্যার আকাশ মধুর মুখরিত। এবার খুকীর লুকোবার পালা, ছেলেটি দূরে চ'লে গেল, খুকী ডেকের শেষে রেলিং-এর কাছে ঘুরছে। একটি কোণ খুঁজছে। রেলিং-এর বড্ড ধারে এসে দাঁড়াল। ও কি, রেলিং দিয়ে মাথা গলাচ্ছে,— ও কি হ'ল ! হায় হায় !

অজয় চেঁচিয়ে উঠল,— খুকী পড়ে — তার কথা শেষ হ'ল না, তার চক্ষের সামনে দিয়ে লাল ফ্রক-পরা সোনালী চুলভরা খুকী আগুনের ঝিলকির মত জাহাজ থেকে গঙ্গার জলে পড়ে গেল। ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত এক নিমেষে ঘটে গেল। অজয় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখ শুকনো, যেন তারই দোষে খুকী জলে পড়ল। তারপর পাগলের মত মরিয়া হয়ে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে খুকীকে বাঁচাতে গেল। খুকী তখন জলে ছটফট ক'রে গোঁ গোঁ শব্দ করছে, ডুবল ব'লে। অজয় তাড়াতাড়ি খুকীর ফ্রক্ ধ'রে তাকে ভাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে। কিন্তু জল সেখানে গভীর, গঙ্গায় তখন জোয়ার এসেছে, স্রোত জোরে বয়ে চলেছে ; আর অজয় সাঁতারও ভাল জানে না, গোলদীঘিতে কিছু শিখেছে মাত্র। অজয়ের মনে হ'তে লাগল, কে যেন তার পা ধ'রে টানছে, খুকী কি ভারি, যেন দশ মণ ! হাত দিয়ে সে তাকে কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারছে না, বুঝি দু-জনে মিলেই ডুববে। প্রাণপণে খুকীকে ভাসিয়ে সে ভেসে

থাকবার চেষ্টা করতে লাগল, সাঁতার কাটতে পারছে না, চোখে-মুখে জল ঢুকে যাচ্ছে, কোন প্রবল স্রোত তাকে তীর থেকে, জাহাজ থেকে, দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সে যদি একা এমনি ভেসে যেত তাহ'লে তার বিশেষ দুঃখ ছিল না, কিন্তু খুকীর প্রাণ বাঁচাতে হবে। জোয়ারের জলের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে খুকীর অসাড় দেহ নিয়ে অজয় যখন তীরে এসে পৌঁছাল তখন সে চোখে অন্ধকার দেখছে; খুকীকে কোন রকমে একটু উঁচুতে কাদামাটির উপর ফেল্লে। তার পা টলতে লাগল, মায়ের মুখ তার চোখে ভেসে উঠল, সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল, তার উপর জোয়ারের ঢেউ ভেঙে পড়তে লাগল।

দুই

অজয় যখন চোখ মেলল, তার মনে হ'ল যেন তার মা তার পাশে বসে শঙ্কাপূর্ণ স্নেহময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, সে চাইতেই সেই স্নিগ্ধ চোখদু'টি আনন্দে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল। অজয় দেখল, একটি ছোট কাঠের ঘরে সাদা বিছানায় সে শুয়ে আছে ; কিন্তু তার পাশে যিনি বসেছিলেন, এখন উঠে দাঁড়ালেন, তিনি কি সত্যই তার মা ? সে বোধ হয় জলে ডুবে ম'রে গেছে, স্বর্গে তার মা'র কাছে এসেছে ; কিন্তু তার মায়ের ত এমন সমুদ্রের মত নীল চোখ ছিল না, এমন সোনার মত হলদে চুল ছিল না ; সে হয়ত গঙ্গার তলায় জলকুমারীদের রাজ্যে এসে পড়েছে।

জলদেবী ইংরেজীতে স্নিগ্ধস্বরে তাকে বল্লেন,— কি খোকা, কেমন ? ভাল বোধ হচ্ছে ?

অজয়ের সব গুলিয়ে গেল, সে বিস্ময়ের স্বরে বল্লে, কেন আমার কি হয়েছে ? আমি কোথায় ?

অজয়ের চোখে পড়ল, তার বিছানার অপর পাশে দু'টি সাহেব দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে একজন বল্লেন,— তুমি জাহাজে, ভয় নেই। জাহাজে কথাটা কানে যেতেই অজয় চমকে উঠল, তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল, খুকীর ডোবার কথা, জলে ঝাঁপিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা, সব কিছু। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল, আবেগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,— খুকী, খুকী কোথায় ?

তার সামনের নীলনয়না নারীটি আবেগকম্পিতস্বরে বল্লেন,—খুকী ভাল আছে, বীর বালক, তোমায় অশেষ ধন্যবাদ, তুমি আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমার এ ঋণ—বলতে বলতে তাঁর স্বর গলায় আটকে গেল, তিনি অজয়কে চুমো খেলেন।

অজয় বিমুগ্ধনেত্রে নারীর দিকে চেয়ে দেখলে, ইনি জলদেবী নন, তার মাও নন, ইনি হচ্ছেন খুকীর মা!

পাশের ছয় ফিট লম্বা সাহেবটি তার হাত ধ'রে করমর্দ্দন ক'রে বল্লেন,—আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ, তুমি আমাদের প্রিয় কন্যার জীবন দান করেছ, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

অজয় সাহেবটির দিকে অবাক হয়ে দেখল, এঁর চোখও নীল, কি ভয়ঙ্কর লম্বা, পালোয়ানের মত চেহারা, ইনি খুকীর বাবা!

খুকীর বাবা-মা'র ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের উচ্ছ্বাসময় আদর পেয়ে অজয়ের মনও আবেগে দুলে উঠল, সে কোন কথা কইতে পারল না, তাড়াতড়ি বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শুধু অস্ফুট স্বরে বল্লে,—কী!

সে দাঁড়িয়ে উঠতেই দ্বিতীয় সাহেবটি তার পাশে এসে তাকে ধরলেন, বল্লেন,—এত উত্তেজনা ওর পক্ষে এখন ভাল নয়! তারপর একটি ছোট ওষুধের গেলাস অজয়ের মুখের কাছে এনে বল্লেন,—এ ওষুধটা খেয়ে ফেল খোকা!

অজয়ের মনে হ'ল, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছে, তার

মাথা ঘুরছে ; সে এক ঢোকে ওষুধটা খেয়ে ফেলল ; খেয়ে ফেলতেই তার দেহমন বেশ চনচনে হয়ে উঠল, যেন নবশক্তি পেল, সে ধীরে ব'লে উঠল,— আমি খুকীকে দেখতে চাই।

তখন খুকীর মা তার হাত ধ'রে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দুধের মত সাদা বিছানায় সোনালি চুল এলিয়ে খুকী শুয়ে আছে, মুখ বড় ফ্যাকাশে, যেন রক্তহীন, মাকে দেখে কি করুণ মিষ্টি হেসে উঠল !

খুকীর মা বল্লেন,— লীনা, এই বীরবালক তোকে জল থেকে তুলে এনেছে ; দুষ্টু মেয়ে, কি কাণ্ড করেছিলি বল্ দেখি— ধন্যবাদ দে —

খুকী তার কচি আঙুল দিয়ে অজয়ের হাত ধ'রে মৃদু দুলিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে,— Danke. খুকীর মা হেসে বলেন,—ও ইংরাজী জানে না, ও তোমায় বলছে, ধন্যবাদ। কি মিষ্টি খুকী ! অজয়ের ইচ্ছা হ'ল, তাকে বুকে জড়িয়ে চুমো খায়, কিন্তু লজ্জায় সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

যে ছেলেটি খুকীর সঙ্গে জাহাজের ডেকে খেলা করছিল, সে যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা অজয় দেখেনি ; তার দিকে চাইতেই সে অজয়ের দুই হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে— আমিও তোমায় আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তুমি আমার ছোট বোনের প্রাণ বাঁচিয়েছ, যা আমার করা উচিত ছিল তাই করেছ।

সমবয়সী সঙ্গী পেয়ে অজয়ের এতক্ষণে মুখ ফুটল, গর্ব্বসুখে ব'লে উঠল,— না, না ধন্যবাদের আমি কিছু ক'রিনি, আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি মাত্র।

ছেলেটি তার ধন্যবাদ শুধু কথায় নয়, কোন কাজ ক'রে জানাতে চাইছিল। সে হঠাৎ ছুটে বার হয়ে গেল, এক মিনিটে তার শার্ট প্যাণ্ট এনে হাজির! অজয়ের দিকে চেয়ে বল্লে,— তোমার জামাকাপড় সব ভিজে গেছে, ও সব বদলান দরকার। খুকীর মা হেসে বল্লেন,— কিন্তু ওর কি রকম মজার কাপড় জামা দেখছ ত, ও রকম ত তোমার নেই। তোমার নাম কি খোকা?

—অজয়।

—অজয়! বেশ সুন্দর নাম। আচ্ছা আমাদের সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় ক'রে দিচ্ছি। এই আমার মেয়ে লীনা, এই আমার ছেলে আর্থার, ডাকনাম টোনি, ইনি আমার স্বামী মাক্স মায়ার, এই জাহাজের কাপ্তেন, আর ইনি হচ্ছেন ডাক্তার ফিসার, জাহাজের ডাক্তার। খুকী পড়ে যেতেই ইনি দেখতে পান, তারপর তুমি কেমন ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুকীকে তীরে তুলে আনলে তা দেখে তিনি ছুটে গিয়ে তোমাকে জাহাজে নিয়ে আসেন, তোমাদের সজ্ঞান ক'রে তোলেন—এঁর কাছে আমাদের ঋণ অসীম।

টোনি বল্লে,—মা, তোমার নাম বল্লে না?

টৌনির মা হেসে বল্লেন,—হাঁ, আমার নাম হচ্ছে আনা মারিয়া, বেশ সহজ উচ্চারণ— সবাই আমায় ফ্রাউ মায়ার ব'লে ডাকে।

খুকী থেকে আরম্ভ ক'রে ডাক্তার, কাপ্তেন সবাইয়ের সঙ্গে অজয় করমর্দ্দন করলে, গম্ভীরভাবে বল্লে—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলুম। যেন কত ভারিক্কে লোক!

বস্তুত, অজয়ের ইংরাজীটা কিছু জানা ছিল, স্কুলের লাইব্রেরীতে ছেলেদের জন্যে লেখা ইংরাজী গল্পের বই যা ছিল তা তার প্রায় সব শেষ হয়ে গেছল। তাছাড়া ছেলেদের ইংরাজী ম্যাগাজিন বা য়্যানুয়াল্ পেলে সে গিলত; শুধু ছেলেদের বই নয়, ডিকেন্সের 'টেল্ অফ্ ট্ সিটীস্', ডুমার 'মন্টি ক্রিষ্টো' তার দু-বার পড়া হয়ে গেছে; শুধু ইংরাজী বুঝতে বা বলতে নয়, ইংরাজী সমাজের আদব কায়দা এ সব নভেল প'ড়ে সে ধারণা ক'রে নিত, কারণ তার জীবনের সব চেয়ে বড় ইচ্ছে ছিল ইয়োরোপে যাওয়া।

টৌনি বল্লে,—অজয়, তোমার ভিজে সাজ ছাড়া দরকার।

অজয় হেসে বল্লে,—অশেষ ধন্যবাদ, ভিজে কাপড়ে থাকা আমার অভ্যাস আছে, আর এবার আমায় বাড়ী ফিরতে হবে, দিদিমা হয়ত ভাবছেন!

খুকীর মা বল্লেন,—তাই ত, এতক্ষণ ত তোমার বাড়ীর কথা মনেই হয় নি!

খুকীর বাবা বল্লেন,— চল, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

অজয় বল্লে,— না, কোন দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।

খুকীর বাবা বল্লেন,— তা হয় না, তোমার শরীর এখনও দুর্ব্বল, তোমার কাপড় ভিজে, তোমাকে গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসা দরকার।

টোনি নাছোড়বান্দা, সে অজয়ের ভিজে পাঞ্জাবী খুলিয়ে নিজের ফর্সা শার্ট পরিয়ে ছাড়লে।

পরদিন বিকালে স্কুলের পর নিশ্চয় আসবে এই কথা দিয়ে লীনা ও তার মায়ের কাছে অজয় বিদায় নিলে। লীনা বার বার মিষ্টিস্বরে কচি হাত দুলিয়ে বল্লে,—auf wiedersehen. অজয় জানত সাহেবরা বিদায়ের সময় গুড-বাই বলে, এ আবার কি কথা? সে একটু অবাক হয়ে চাইতেই লীনার মা তাকে বুঝিয়ে দিলেন, ও হচ্ছে জার্ম্মান কথা, মানে আবার দেখা হবে। তাঁরা সব জার্ম্মান কি না, এ জাহাজখানা জার্ম্মান জাহাজ, হম্‌বুর্গ থেকে এসেছে।

সে জার্ম্মানদের মধ্যে! ভাবতে অজয়ের বুকটা এক রহস্যময় সুখে দুলে উঠল! কাপ্তেনসাহেব অজয়কে একখানা ট্যাক্সিতে তুল্লেন, টোনিও ছাড়লে না, সঙ্গে চল্ল। ট্যাক্সি অজয়ের বাড়ীর দিকে ছুটল। মোটরগাড়ীতে অজয় খুব কমই চড়েছে, ট্যাক্সিতে উঠে তার বড় মজা লাগতে লাগল। সে পথের

দু-পাশের লোকের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল, যদি কোন পরিচিত ছেলে দেখতে পায় সে ট্যাক্সি ক'রে জার্ম্মান জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে কলিকাতা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে ! যেন একটা রহস্যময় জীবন ! কি মজা ! আচ্ছা, পাড়ায় যখন সে ট্যাক্সি থেকে নামবে, পাড়ার ছেলেরা সব জল্পনা-কল্পনা করবে, তাকে প্রশ্ন ক'রে জ্বালাতন করবে, কিন্তু সে কোন উত্তর দেবে না, সটান বাড়ী চ'লে যাবে। কিন্তু বাড়ীর সামনে পর্য্যন্ত ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না, মামাবাবুরা যদি দেখেন ত প্রশ্নের চোটে অস্থির হতে হবে।

অজয় তাদের বাড়ীর গলির ভিতর আর ট্যাক্সিকে নিয়ে যেতে দিলে না, সামনের মোড়ে নামলে; হতাশভাবে দেখলে পাড়ার কোন ছেলেই সেখানে নেই, অন্য সময় ত কত ছেলে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আজ কিন্তু কেউ নেই, যেন চক্রান্ত ক'রে সব সরে পড়েছে।

কাপ্তেনসাহেব তার মামা ও দিদিমা'র সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু অজয় বল্লে,— সে কিছুতেই হতে পারে না। এই জার্ম্মান কাপ্তেন দিদিমা'র সঙ্গে দেখা করবে এ দৃশ্য সে কল্পনাতেও আনতে পারল না, ভাবতে তার ভয়ানক হাসি পেল। পরদিন সে নিশ্চয় জাহাজে যাবে তার চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে

অজয় বিদায় নিলে, ট্যাক্সির দিকে চেয়ে টোনির অনুকরণে সে অনেকক্ষণ হাত নাড়লে, তারপর একছুটে বাড়ীতে ঢুকে তার ঘরে গিয়ে বসল।

তিন

চার-পাঁচ দিন কেটে গেছে ; রোজ বিকেলে অজয় তার চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে জাহাজে যায়, খুকীকে তার বড় ভাল লাগে, তার সোনালী রঙের চুলগুলি নিয়ে খেলা করে। আর খুকীর মা তাকে নিজের মায়ের মত যত্নআদর করেন, বিশেষত কত রকমের কেক্ স্যাণ্ডউইচ্, কত রকমের খাবার খেতে দেন, অজয় সে-সব জীবনে দেখেনি ; এ সব খেয়ে এসে বাড়ীতে রাতে সে আর খেতে পারে না, অসুখ করেছে, খিদে নেই ব'লে কাটাতে হয়।

কাপ্তেনসাহেব দু-দিন ট্যাক্সি ক'রে অজয়কে তার বাড়ী পৌছে দিয়ে গেছেন ; একদিন পাড়ার ছেলেরা সবাই ছিল, দেখেছে ; সে যেন রোজই ট্যাক্সি ক'রে আসে এমনি ভাব দেখিয়ে সে সটান বাড়ী চ'লে গেল। কিন্তু পরদিন আর ট্যাক্সি ক'রে আসতে তার সাহস হ'ল না, পাড়ার ছেলেরা যদি মামাদের ব'লে দেয় তাহলে বড়ই মুস্কিল হবে।

টোনির সঙ্গে অজয়ের গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছে, টোনি ভাল ইংরেজী বলতে পারে না, সে-ই বা কি পারে ; কিন্তু সে জন্য তাদের কথা বলতে, মনের ভাব বোঝাতে কিছু আটকায় না। এক সন্ধ্যায় তারা ডেকে ব'সে গল্প করছিল।

অজয় বল্লে,— জার্ম্মানী কেমন দেশ ভাই ?

টৌনি হেসে গর্ব্বের সঙ্গে বল্লে,—খুব সুন্দর দেশ, তোমাদের বাংলার মত অত গরম নয়।

অজয় ক্ষুব্ধ হয়ে ব'লে উঠল,— আমাদের বাংলা দেশ কত সুন্দর, তা ত তুমি দেখ নি, এমন সুন্দর নদী তোমাদের আছে?

টৌনি ধীরে বল্লে,— এত বড় নেই বটে তবে ছোট ছোট অনেক সুন্দর নদী আছে।

অজয় টৌনির মুখে চোখ রেখে বল্লে,— আমার ভাই জার্ম্মানীতে — ইয়োরোপে — যেতে বড় ইচ্ছা করে।

টৌনি খুশী হয়ে ব'লে উঠল,—বেশ ত, চল আমাদের সঙ্গে।

অজয়ের বুক নেচে উঠল, তার জীবনের স্বপ্ন কি সত্য হবে! সে সন্দেহের সুরে বল্লে,— তোমার বাবা কি আমায় নিয়ে যাবেন?

টৌনি দৃঢ় স্বরে বল্লে,— নিশ্চয় নিয়ে যাবেন, আমি বলছি।

টৌনির বাবা ক্যাবিন থেকে বার হয়ে তাদের দিকে আসছিলেন, টৌনি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধ'রে আগ্রহের স্বরে বল্লে,— বাবা, বাবা, শোন, অজয় আমাদের সঙ্গে আমাদের দেশে যেতে চায়, জার্ম্মানী দেখতে তার বড় ইচ্ছে, তাকে আমাদের সঙ্গে জাহাজে নিয়ে যাব, কেমন?

প্রস্তাবটা শুনে কাপ্তেনসাহেব একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু তিনি অজয়ের পিঠ চাপড়ে হেসে বল্লেন,— তা তোমার বাড়ীর লোকেরা তোমায় ছাড়বে কেন? আমি নিয়ে যেতে

পারি, কিন্তু বাড়ীর লোকের ত অনুমতি চাই।

অজয় ভাবলে, তার মামাদের অনুমতি! ভাবতে তার বুক ভয়ে দুলে উঠল। তার মুখ ম্লান হয়ে গেল সে সন্ধ্যায় গল্প আর তেমন জমল না।

কাল ভোরে জাহাজ কলিকাতা ছেড়ে চ'লে যাবে, গঙ্গানদী পেরিয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে কত সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপে যাবে। অজয়ের স্বপ্নের ইয়োরোপ! জাহাজে এই কয় দিন অজয় যেন কোন সুখ-স্বর্গ পেয়েছিল; দু-দিন স্কুল পালিয়ে সে সারা দিন টোনির সঙ্গে কাটিয়েছে। কাল জাহাজ চ'লে যাবে, তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে।

জাহাজে চ'ড়ে সে ইয়োরোপে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু কাপ্তেনসাহেব কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। টোনি তার বাবা-মাকে কত বলেছে, এক দিন খায়নি, অভিমান করেছে; খুকীও তাদের শিক্ষামত আব্দার জুড়েছে, অজয়ও একদিন মুখ ফুটে বলেছিল, কিন্তু টোনির বাবা-মা তাকে ইয়োরোপে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নিতে চান না, সে নাবালক, তার অভিভাবকের অনুমতি না পেলে কি করে নিয়ে যাবেন!

সন্ধ্যাবেলায় সে সবার কাছে বিদায় নিল। খুকীর মা তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেল্লেন, মা'র দেখাদেখি খুকীও কাঁদলে, কাপ্তেনসাহেবের মুখ ভার ভার, এই প্রিয়দর্শন বীরবালককে তিনি তাঁর জাহাজে ক'রে নিয়ে যেতে পারলেন

না ভেবে তিনি বিষণ্ণ! কিন্তু টোনির বিষাদটা একটু মেকী মনে হ'ল, আর অজয় বিশেষ বিষাদের উচ্ছ্বাস দেখালে না। তাকে যে কাপ্তেন সাহেব জাহাজে ক'রে ইয়োরোপে নিয়ে যাবেন না, তার জন্য সে কেয়ার করে না, এই রকম মুখের ভাবখানা।

ঘর অন্ধকার ক'রে অজয় চুপ ক'রে বসেছিল, গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বেজে উঠতে সে চমকে দাঁড়িয়ে উঠল। এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে দরজা খুলে পা টিপে টিপে সে বারান্দায় বাহির হ'ল; পাশের ঘরে দিদিমা শুয়ে আছেন, নিঃশব্দে সে ঘরে প্রবেশ করল! দিদিমা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছেন, তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে তার ভয় হ'ল, যদি জেগে ওঠেন! অজয় তাঁর মাথার কাছে একটি চিঠি রাখল, তারপর তাঁর পায়ের কাছে মেজেতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে এই স্নেহময়ী বৃদ্ধার সুপ্তিশান্ত মুখের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়ে রইল। বারান্দা দিয়ে একটা বেড়াল যেতে তার চমক ভাঙল। তাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আর দেরি করলে চলবে না। মামাদের ঘরে যেতে তার ইচ্ছা হ'ল না, সাহসও হ'ল না। নিজের ঘরে গিয়ে সে একটি ছোট পুঁটলি নিলে। তারপর পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল, বাতাসে একটা দরজা

নড়ে উঠল, একটা জানলা শব্দ ক'রে বন্ধ হ'ল, তার বুক কেঁপে উঠল, কেউ বুঝি জেগে উঠে তাকে দেখতে পায়। সিঁড়ির তলায় স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। না, কেউ আসছে না। আবার পা টিপে টিপে বাড়ীর পেছনের দরজায় গেল, ধীরে ধীরে খিল খুলে পথে বার হয়ে দরজা ভেজিয়ে সে সামনের জনহীন নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে ছুট্ দিলে, একেবারে রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছল। মোড়ে এসে থমকে দাঁড়াল; না, ছুটে আসাটা ঠিক হয় নি, রাস্তায় কেউ দেখে তাকে সন্দেহ করতে পারে, তার হাতে আবার পুঁটলি রয়েছে। কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকাও বিপদজনক, পাড়ার কোন লোক এত রাত্রে তাকে দেখলে প্রশ্ন করতে পারে।

অজয় এগিয়ে চল্ল, কিন্তু অতখানি পথ ত সে হেঁটে যেতে পারবে না। ট্যাক্সি ক'রে যাবে? না, ট্যাক্সিওয়ালাদের বিশ্বাস নেই, আর এত রাত্রে একটি ছোট ছেলেকে পুঁটলি নিয়ে যেতে দেখে তারা সন্দেহ করতে পারে। কেন যে পুঁটলিটা এনেছিল! কিন্তু এই বই, খাতা, মায়ের ফটো — এ সব জিনিষ সে কি ক'রে ফেলে যাবে? হনহন ক'রে সে এগিয়ে চল্ল। দূরে একটা বাস্ আসছে, বাসে যাওয়াই ভাল।

কম্পিতপদে অজয় বাসে উঠল, বাস-কন্‌ডাক্টর তার দিকে এমনভাবে চাইল, তার ভয় হ'ল, বুঝি জিজ্ঞেস করে,— এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ? না, সে কিছু জিজ্ঞেস করলে না, শুধু টিকিট

চাইল। বড় বাস, দু'তিন জন মাত্র লোক, খোলা পথ পেয়ে দৈত্যের মত ছুটে চলেছে। অজয় রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। কলিকাতা শহরটা তার মোটেই ভাল লাগে না বটে, কিন্তু ছেড়ে যেতে ত মন কেমন করছে!

বাস হাওড়ার পোলের সামনে আসতেই অজয় তাড়াতাড়ি বাস থেকে নামল। তাড়াতাড়িতে পুঁটলি নামাতে ভুলেই যাচ্ছিল, বাস-কনডাক্টর তাকে ডেকে বল্লে, -- খোকা, তোমার পুঁটলি। বাস-কনডাক্টরদের প্রতি সে বড় অবিচার করেছে, তারা সত্যি লোক ভাল।

হনহন ক'রে সে জেটির দিকে চল্ল। মোড়ের পুলিশটা তখন পানওয়ালার দোকানে ব'সে গল্প করছে, ভালই, তাকে দেখতে পয়নি।

গঙ্গার তীরে তার চিরপরিচিত জাহাজটির সামনে এসে দাঁড়াতে অজয়ের বুক দুলে উঠল। চারিদিক নিঝুম, ডেক নিঃশব্দ, সামনের কেবিনগুলি অন্ধকার — শুধু পেছনের দু'টি কেবিনের আলো গঙ্গার জলে ঝক-মক করছে। চুপ ক'রে অজয় দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজখানি দেখতে লাগল, এ যেন কোন্ রহস্যপুরী, তাতে প্রবেশ করবার গোপন পথটি কোথায়?

ডেকে একটি কাল মূর্ত্তি দেখা গেল, তারপর একটি নীল আলো জ্বলে উঠল, টর্চের নীল আলো ডেক থেকে গঙ্গার জলে পড়ল, অজয় দেখতে পেল ডেক থেকে একটা মোটা দড়ি

জাহাজের গা দিয়ে গঙ্গার জলে এসে ঠেকেছে। তাহলে সব ঠিকঠাক, পথ পরিস্কার।

অজয় তার পুঁটলি পিঠে ভাল ক'রে বাঁধলে, তারপর 'জয় মা দুর্গা' ব'লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধীরে সাঁতার কেটে জাহাজের গায়ে ঝোলান মোটা দড়িটি ধরল। দড়ি ধ'রে উপরে উঠতে লাগল। এতক্ষণে সন্দেহে ভয়ে তার মন দুলছিল, কিন্তু হাতে দড়িটি পেয়ে আশায় আনন্দে তার দেহে-মনে নব-জীবন এল। প্রাণপণে দড়ি ধ'রে সে উঠতে লাগল। ও! জাহাজটা কি উঁচু! দেখে ত এত উঁচু মনে হয়নি, এ ছয়-সাত তলা হবে! অর্দ্ধেক উঠে তার হাত একটু অবশ হয়ে এল, কিন্তু এখন অবশতা ভীরুতার সময় নয়। ওই ত উপরে নীল আলো জ্বলে উঠেছে, ওই আশার আলো, ভয় নেই।

প্রাণপণে অজয় দড়ি ধরে উঠতে লাগল, আর দশহাত, পাঁচহাত, দু-হাত! জলে ভিজে কাপড়গুলো কি ভারি হয়েছে, তার উপর পিঠে পুঁটলি।

ডেকের রেলিং-এ হাত দিতেই টোনি অজয়ের হাত ধ'রে তাকে তুলে নিলে; অজয় রেলিং পেরিয়ে ডেকে দাঁড়াতেই সে অজয়ের হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে,—অজয় ভাই, এসেছ!

অজয়ের মুখ দিয়ে কোন কথা বার হ'ল না, সে হাঁপাচ্ছে, তাছাড়া আনন্দেও মন নাচছে, সে অস্ফুটস্বরে জার্ম্মান ভাষায় বলে উঠল, — ইয়াভোল্, অর্থাৎ হাঁ, হাঁ।
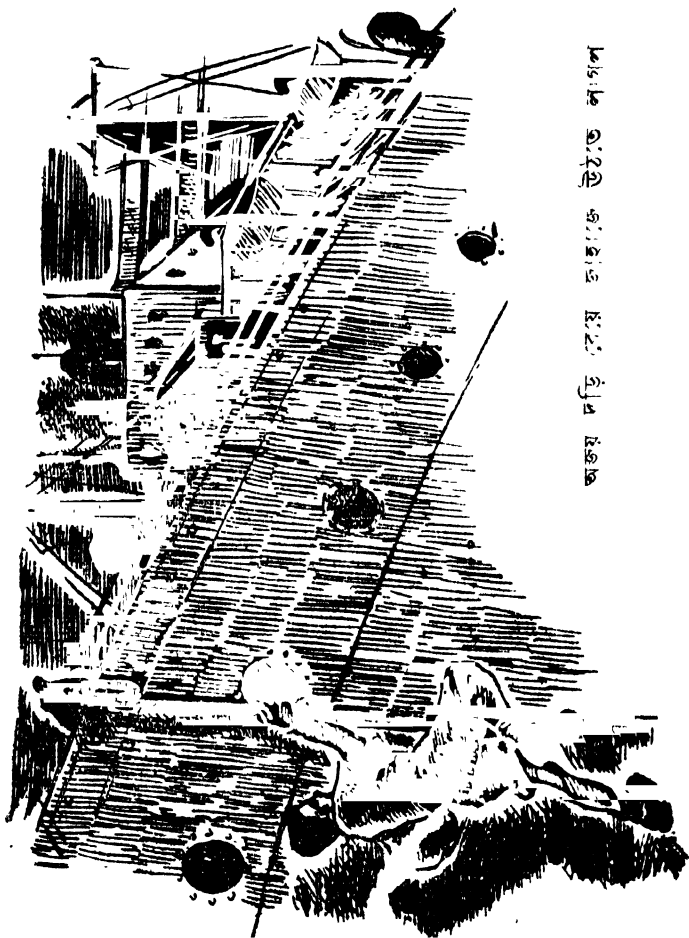
অজয় দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে লাগল

টৌনি শান্তস্বরে বল্লে, — চুপ, আর কথাটি নয়, নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এস। একবার সে তার টর্চটি জেলে অজয়কে সামনের পথটি দেখালে, তারপর তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্ল। অজয় টৌনির হাত ধ'রে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে লাগল। টৌনি যে তাকে নিয়ে কত সরু করিডর পার হ'ল, কত সরু সিঁড়ি নামল এঁকেবেঁকে, কত অন্ধকার, কোন্ রহস্য পথ দিয়ে সে যেন স্বপ্নের মধ্যে চল্ল; নেমে চলেছে ত নেমেই চলেছে, যেন কোন্ পাতালপুরীতে নেমে যাচ্ছে।

অবশেষে গোলকধাঁধা ঘোরা শেষ হ'ল। টৌনি টর্চ জ্বেলে একটি ছোট্ট ঘরের দরজা খুল্লে। তাকে ঘর বলা ঠিক চলে না, যেন একটা গহ্বর। উপরে ছোট একটি গর্ত্ত দিয়ে একটু বাতাস আসছে। টৌনি ধীরে বল্লে,—অনেক খুঁজে খুঁজে এই জায়গাটি বার করেছি, এখানে কেউ আসবে না, অন্তত দু-তিন দিন, তত দিনে আমরা সমুদ্রে পড়ব। আমি কয়েকটা বালিশ ও চাদর এনে রেখেছি, আমার একটা প্যাণ্ট ও শার্টও রেখেছি, তোমার কাপড় জামা ত সব ভিজে গেছে, শীগগীর ছেড়ে ফেল। ঘরটা বড় গরম, তা কি করা যায়! টর্চটা তোমার কাছে রাখ, আমি অন্ধকারে ঠিক যেতে পারব।। তোমার ভয় করবে না ত?

অজয় তখনও যেন স্বপ্নের ঘোরেই রয়েছে, হেসে বল্লে,— না, না।

টোনি বল্লে, — আচ্ছা, তাহলে আমি যাই ভাই, তুমি বরঞ্চ দরজাটা খুলে রাখ, যদি গরম বোধ হয়, না হ'লে বন্ধ ক'রে রাখলেই আরো ভাল হয়।

অজয় বল্লে, — আমি বন্ধ ক'রেই রাখছি।

টোনি অজয়ের করমর্দ্দন ক'রে বল্লে, — তাহলে চুপচাপ শুয়ে থাক, কোন ভয় নেই, আমি যাই ভাই, মা যদি জেগে আমায় দেখতে না পান আবার খোঁজাখুঁজি সুরু করবেন।

অজয় স্বপ্নমুগ্ধের মত বল্লে, — না, কোন ভয় নেই, তুমি এস।

ভোরবেলা যখন সশব্দে নোঙর তু'লে জাহাজ কলিকাতা ছেড়ে গঙ্গা দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে চল্ল, তখন অজয় মালের বস্তাঘেরা ছোট্ট ঘরটির কাঠের মেজেতে তার পুঁটলিটি জড়িয়ে নিশ্চিন্তমনে শান্তভাবে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ; ইঞ্জিনের ঝকঝক শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার নাসিকার গর্জ্জন হচ্ছে।

চার

এই সমুদ্র ! পাটের বস্তাঘেরা ছোট্ট ঘরের কোণে কতক-গুলি বস্তা জড় ক'রে তার উপর ব'সে অজয় পোর্ট-হোল দিয়ে সমুদ্র দেখছিল,—নীল সিল্কের চাদরের মত অগাধ জলরাশি স্থির প'ড়ে রয়েছে, সামনে যতদূর চোখ যায়, জল, শুধু জল : নীল জল যেখানে নীল আকাশের সঙ্গে মিশেছে সেখান কতদূর ? জাহাজটা সেই সমুদ্র ও আকাশের মিলন-স্থানটিতে পৌঁছতে জোরে চলেছে, কিন্তু জাহাজ যতই এগিয়ে যাচ্ছে, চক্রবাল ততই স'রে যাচ্ছে, এ যেন জাহাজের সঙ্গে ওই দূরেব দিগন্তরেখার লুকোচুরি খেলা চলেছে।

কিন্তু সারাদিন আর জল দেখতে ভাল লাগে না। পৃথিবীব তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল, একথা অজয় ভূগোলে পড়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে এত জল আছে তা সে কখন কল্পনাও করতে পারেনি ; জাহাজটা দিনের পর দিন সামনে পূরো দমে চলেছে, ইঞ্জিনের ঝকঝক শব্দে তার ঘর দিনরাত কাঁপছে, কিন্তু জল আর ফুরোয় না ! জল দেখতে আর তার ভাল লাগে না।

এই ছোট্ট ঘরটিতে দিনরাত সে বন্দী, তাই তার বোধ হয় ভাল লাগছে না। টোনি মাঝে মাঝে লুকিয়ে আসে, তাকে খাবার দিয়ে যায় ; বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত খাবারও একঘেয়ে, দু-বেলা রোজ একই খাবার — রুটী, মাখন, জ্যাম,

সসেজ আর চকোলেট। মাঝে মাঝে আপেল বা কমলালেবুও আসে। বেচারা টোনি! অনেক মতলব করে নিজে বোধ হয় না খেয়ে এসব খাবার তাকে আনতে হয়; সে রোজ নতুন খাবার কোথায় পাবে?

এ যেন জেলখানাতে বাস, আর গুদোম-ঘর ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই; এক রাতে সে ধীরে ধীরে উপরের ডেকে উঠেছিল, একটা খালাসী আর একটু হ'লেই তাকে দেখে ফেলেছিল, অজয় আর সে জন্যে এই ঘর ছেড়ে বের হয় না। কয়েদখানা! তার জন্যে তার দুঃখ নেই, সে ত ইচ্ছে ক'রেই এ দুঃখ বরণ করেছে, আর দুঃখ না ক'রে কে কোন্ দিন বড় হতে পেরেছে! দুঃখভোগকে সে ভয় করে না। এখন ভালয় ভালয় ইয়োরোপ পৌঁছতে পারলে হয়। তা অজয়ের সময় মন্দ কাটছিল না। তার ছোট পুঁটলিতে তার মা'র ফটো, জার্ম্মানভাষা শেখবার বইয়ের সঙ্গে একটা তক্‌লি ও একটা বাঁশের বাঁশিও ছিল। টোনিকে তক্‌লি দেখিয়ে যখন সে বলেছিল, তুলো পেলে এই দিয়ে সে সুতো তৈরী ক'রে দিতে পারে, টোনি পরিহাস ভেবে হেসে উঠেছিল; টোনি বলেছিল, — ওটা বুঝি এক রকম খেলবার লাট্টু! কিন্তু অজয় যখন তাকে সত্যি বোঝাল, এই তক্‌লি দিয়ে তার দিদিমা কত সুতো কাটেন, তখন টোনি তুলোর সন্ধানে চল্ল; প্রথমে এক বালিশ ছিঁড়ে কিছু তুলো নিয়ে এল, কিন্তু সে তুলোতে সুতো কাটা

গেলো না, তারপর দু-দিন ধ'রে জাহাজ জুড়ে গোপনে তুলোর সন্ধান চল্ল। চেষ্টা বৃথা হ'ল না, খোঁজ পাওয়া গেল, এই জাহাজে ভারতবর্ষ থেকে কিছু তুলোর বস্তা ইয়োরোপে যাচ্ছে। বস্তাগুলি কোথায় তাও খুঁজে বার হ'ল, তকলি ঘুরিয়ে অজয় যখন দেখালে তুলো থেকে এই ভারতীয় লাট্টু দিয়ে সত্যিই স্থতো তৈরী করা যায়, তখন টোনি খুবই অবাক হয়ে গেল।

তুলোর অফুরন্ত সরবরাহ পাওয়া গেছে, অবশ্য এমনি ক'রে তুলো চুরি করা ঠিক হচ্ছে না, তা কি করা যায়! জার্ম্মান ভাষা শেখবার বইখানি খুলে অজয় জার্ম্মান শব্দ মুখস্থ করে আর তার সঙ্গে তকলি ঘোরায়, মাঝে মাঝে চকোলেট খায় বা নীল সমুদ্রের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে — এমনি ক'রে কতদিন কেটে গেল। আর তার ভাল লাগছে না এই ছোট্ট ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকতে।

সন্ধ্যার আলো অসীম নীল জলে ঝলমল করছে, আকাশে বাতাসে কোন্ মায়ার রং লেগেছে, সামনের অফুরন্ত জলপথ সোনালী, যেন কোন রূপকথার রাজকন্যার স্বপ্নপুরীতে যাবার মায়াপথ। সোনার বড় থালার মত সূর্য্য পশ্চিমদিগন্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দিকে সোনালী দৃষ্টিতে চেয়ে। সাগরের অতলে কোন্ স্নিগ্ধশয্যা তার জন্যে বুঝি রচিত রয়েছে, এবার ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলের মধ্যে সে ডুবে যাবে, তারপর

চারিদিকে মায়াময় অন্ধকার হয়ে আসবে, সমুদ্র আরও রহস্যময় আরও ভীষণ হবে, একে একে তারা উঠবে। এই সময়টি অজয়ের বড় ভাল লাগে, প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত দেখতে তার মন উন্মুখ হয়ে থাকে, এ কোন্ অত্যাশ্চর্য্যাকর রহস্যময় ব্যাপার! তারপর সূর্য্য যখন ডুবে যায়, সমুদ্রের জল কালো হয়ে আসে, সে তার বাঁশি বাজাতে বসে, তার মন উদাস হয়ে ওঠে, তার পাড়ার কথা, দিদিমা'র কথা মনে পড়ে।

তকলি রেখে অজয় সমুদ্রের দিকে চেয়েছিল, এবার সূর্য্যাস্ত হবে। এমন সময় তার মনে হ'ল কে যেন দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। টোনি ত এ সময় আসে না, সে চমকে চাইতেই দেখলে ফ্রাউ মায়ার! ফ্রাউ মায়ার দরজায় দাঁড়িয়ে, তাঁর পেছনে হয় ত কাপ্তেন মায়ারও আছেন। কি করা যায়, বস্তার মধ্যে সে লুকোবার চেষ্টা করবে না কি? এত দিনের এত কষ্ট বুঝি বৃথা হ'ল!

ফ্রাউ মায়ার দরজা দিয়ে ঢুকে হেসে বল্লেন, — শুভ সন্ধ্যা, অজয়! তাঁর হাসিটা অজয়ের মোটেই ভাল লাগল না, সে গম্ভীরস্বরে বল্লে, — শুভ সন্ধ্যা ফ্রাউ মায়ার!

— অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা।

— হাঁ, অনেক দিন পরে বটে।

অজয় ভাবতে লাগল, এখন আরও কিছুদিন দেখা না হলে যে আরও ভাল ছিল। অজয় যে ভয় পেয়েছে তা

বুঝতে পেরে ফ্রাউ মায়ার স্নিগ্ধ স্বরে বল্লেন, — তোমার কোন ভয় নেই, টোনি আমায় সব বলেছে। অজয়ের মুখ কাল হয়ে গেল। টোনি বিশ্বাসঘাতক! ফ্রাউ মায়ার অজয়ের হাত নিজের হাতে নিয়ে বল্লেন, — তুমি অমন গুম্ হয়ে গেলে কেন, তোমার কোন ভয় নেই বলছি, টোনি আমায় বলেছে বটে, কিন্তু আমার স্বামীকে কিছু বলা হয় নি, হেয়ার কাপ্তেন কিছুই জানেন না, আমি তোমাদের চক্রান্তের দলে, তোমাদের দিকে।

অজয় ফ্রাউ মায়ারের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লে, — ধন্যবাদ ফ্রাউ মায়ার, অশেষ ধন্যবাদ।

তার মুখে হাসি খেলে গেল।

ফ্রাউ মায়ার স্নিগ্ধ স্বরে বল্লেন, — এখানে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

— কষ্ট, না মোটেই নয়, আর কষ্ট না করলে কে কেষ্ট পায় বলুন।

— তা বটে, আর তিন-চার দিন একটু কষ্ট করে থাক, তারপর কলম্বো পার হয়ে গেলে আমি আমার স্বামীকে বলব। কলম্বো পার হয়ে গেলে যে কাপ্তেন মায়ার জাহাজ ফিরিয়ে তোমায় ভারতে রেখে যেতে আসবেন তা মনে হয় না, আর তা যদি করেন ত আমরাও তোমার সঙ্গে নেমে যাব।

অজয়ের বুক অজানা ভয়ে একটু দুলে উঠল, সে ফ্রাউ

মায়ারের হাতটা জোরে চেপে ধরল ।

ফ্রাউ মায়ার বল্লেন, — তোমার খাওয়ার কিছু কষ্ট হচ্ছে বুঝছি, এই এক টিন বিস্কুট তোমার জন্যে এনেছি, আর এই কাগজ-মোড়া মুরগীর ঠাণ্ডা মাংস আছে : টোনি আমায় কয়েক দিন আগে বল্লেই পারত, তোমায় এত কষ্ট পেতে হ'ত না। হাঁ, তোমার কি 'টক্‌লি' আছে, সুতো কাটা যায় —

— সে ত এখন ভাল দেখতে পাবেন না।

— আচ্ছা কাল দেখব'খন।

অজয় কিন্তু ছাড়ল না, তক্‌লিতে সুতো কাটা দেখালে, তারপর বাঁশি শোনালে। অজয় একটি সাঁওতালি গান জানত, তার সুরটি ফ্রাউ মায়ারের বড় ভাল লাগল। তিনি কিন্তু বেশীক্ষণ শুনতে চাইলেন না, বল্লেন, — আমার স্বামী হয়ত আমায় খুঁজবেন। শুভ সন্ধ্যা, কোন ভাবনা কোরো না, আমি তোমার দিকে আছি, জেনো।

— ধন্যবাদ ফ্রাউ মায়ার! বলে অজয় ফ্রাউ মায়ারের হাতে চুমো খেলে। এরকম মহিলার হাতে চুমো খেয়ে সম্মান দেখাতে সে জাহাজের ডাক্তারকে প্রায়ই দেখেছে।

কয়েকদিন পরে।

প্রভাতের আলো সাগরের নীল জলে ঝিক্‌মিক করছে ; রাতে গরমে অজয়ের ভাল ঘুম হয়নি, তাই ভোরের ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাসে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন তার ঘুম ভাঙল,

দেখে, চারিদিক আলোয় আলো — অনেক বেলা হয়ে গেছে নিশ্চয়। তা বেলা করে উঠলেই বা কি! তবে তক্‌লি কিছু কম ঘোরানো হবে যে।

সে প্রভাতে কিন্তু আর অজয়ের তক্‌লি ঘোরানো হ'ল না। টোনি সশব্দে এসে হাজির হ'ল। অজয়ের দু-হাত ঝাঁকুনি দিয়ে নাচুনির সুরে বল্লে, — সুপ্রভাত, সুপ্রভাত!

আনন্দে তার মুখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

অজয় অবাক হয়ে বল্লে, — কি ব্যাপার টোনি, তুমি বড় শব্দ করছ, কেউ আবার জানতে না পারে।

টোনি হেসে বল্লে, — আর ভয় নেই অজয়, ওঠ শীগগীর, ভাল সাজ ক'রে নাও, বাবা-মা খাবার টেবিলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

অজয় আরও আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে — কি রকম!

টোনি বল্লে, — আমরা কাল কলম্বো ছেড়ে গেছি জান? মা বাবাকে আজ সকালে তোমার কথা বল্লেন, যে, তুমি এই জাহাজে চলেছ। বাবা প্রথমে খুব রাগ করলেন। তারপর মা যখন তাঁকে বোঝালেন, তোমার মামারা তোমার সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর বা গোলমাল করবেন না, তুমি চ'লে এসেছ ব'লে তাঁরা বরং দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছেন, তখন বাবা বল্লেন,— আচ্ছা, তাহলে চলুক আমাদের সঙ্গে ইয়োরোপে।

কথাগুলো শুনে অজয় বস্তার শয্যা থেকে লাফিয়ে পড়ল

ব্রেকফাষ্ট টেবিলে অজয়

মেজেতে। টোনির হাত জড়িয়ে ধরে বল্লে, — টোনি, তুমি সত্যিই আমার বন্ধু !

ফিট্‌ফাট্‌ সেজে অজয় যখন জাহাজের উপরে খাওয়ার-ঘরে এসে হাজির হ'ল তখন ব্রেক-ফাস্ট খাওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। সে প্রথমেই কাপ্তেন মায়ারের দিকে গিয়ে তাঁর করমর্দ্দন ক'রে বল্লে, — অশেষ ধন্যবাদ কাপ্তেন, অশেষ ধন্যবাদ।

কাপ্তেন হেসে বল্লেন, — ধন্যবাদ দিতে হয়, আমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দাও, আমাকে নয়, তিনি ভোর থেকে তোমার পক্ষ হয়ে যা বক্তৃতা করছেন !

ফ্রাউ মায়ার বল্লেন, — তোমার ওই নিরেট মাথায় একটা ভাল কাজের কথা ঢোকাতে যে খুবই পরিশ্রম করতে হয় তা বেশ বুঝতে পেরেছি। এস অজয়, আমার পাশের চেয়ারে তোমার বসবার জায়গা।

অজয় ফ্রাউ মায়ারের সঙ্গে ও ডাক্তার ফিসারের সঙ্গে করমর্দ্দন করল; লীনা ত অজয়কে দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, — অজয়, অজয় — কোথা ছিলে তুমি অজয় !

অজয় লীনাকে চুমো খেয়ে বল্লে, — জানিস্‌ না, আমি যে তোদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিয়ে আসছিলুম।

খুকী অবাক হয়ে বল্লে, — সত্যি ! মা, আমি সমুদ্দুরে সাঁতার দেব।

ফ্রাউ মায়ার বল্লেন, — আচ্ছা দেবে, এখন দুধটা খা দিখিন !

— দুধ খাব না, দুধ বিচ্ছিরি, চকোলেট খাব, কফি খাব।

কাপ্তেন মায়ার বল্লেন, — আচ্ছা দুধটা আগে খেয়ে নাও, তাহলে একটি চকোলেট পাবে।

চকোলেটের নাম শুনে লীনা দুধের কাপ মুখে তুল্লে। ফ্রাউ মায়ার ও টোনির মধ্যে ব'সে অজয় খেতে আরম্ভ করলে---ডিম সিদ্ধ, রুটি টোস্ট, মাখন, জ্যাম, কফি, আপেল, কত রকমের খাবার। কিন্তু খাবারের প্রতি তার তত মন ছিল না, সে আজ মুক্তি পেল, যেন কোন কারা-গহ্বর থেকে পৃথিবীর আলোয় মুক্তি পেল; আকাশের জাগরণপূর্ণ আলোর দিকে, সমুদ্রের জলে আলোছায়ার খেলার দিকে, এই মায়ার-পরিবারের দিকে আনন্দপূর্ণ চোখে সে চাইল, তার মনে হ'ল পৃথিবী কি সুন্দরী, জীবন কি সুখকর!

পাঁচ

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, নীল সাগরের অগাধ জল কেটে জাহাজ চলেছে। জাহাজখানা এতদিন ছিল কারাগার, এখন তা নিজের ঘরের চেয়ে আপনার হয়ে উঠেছে অজয়ের কাছে। ইঞ্জিন-ঘর থেকে আরম্ভ ক'রে দাঁড় চালিয়ে জাহাজের গতি-নিয়ন্ত্রিত করবার উঁচু ঘর পর্য্যন্ত সব জায়গায় অজয়ের অবাধ গতি। প্রথম ক'দিন অজয় জাহাজখানা তন্ন তন্ন ক'রে দেখলে, দেখায় তার ঔৎসুক্য ফুরোয় না। জাহাজখানা এক মহা রহস্য-পুরী; যেন একটা গ্র্যাণ্ড হোটেল ভেসে চলেছে। ডেকের উপর ঘরগুলি দেখে মনে হয় না তলায় এত ব্যাপার। সব তলায় হচ্ছে ইঞ্জিন-ঘর, আট দশ তলা নেমে যেতে হয়। যে লোকগুলো বয়লারে সর্ব্বদা কয়লা দিচ্ছে তাদের দেখে অজয়ের বড় দুঃখ হ'ল, বেচারারা কয়লার গুঁড়ো খেয়ে ত ভূত হয়েছে, তার ওপর কি ঘামছে! সমুদ্রের একটু হাওয়া পাচ্ছে না, একটু নীলাকাশ বা নীলসমুদ্র দেখতে পাচ্ছে না, পয়সা রোজগারের জন্য মানুষ কত কষ্টই না করে।

গরম ইঞ্জিন-ঘর থেকে যখন সে খাবার রাখার ঘরে এল, অবাক হয়ে গেল; একই জাহাজে আগুনের মত গরম ঘর আবার বরফের মত ঠাণ্ডা ঘর। খাবার জিনিষ রাখার ঘর, অর্থাৎ জাহাজের ভাঁড়ার ঘরটি চার দিকে বড় মোটা পাইপ দিয়ে

ঘেরা, সেই পাইপ দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়ে ঘরটিকে বরফের মত ঠাণ্ডা রেখেছে, সে ঘরে মাছ, মাংস, ডিম, ফল সব খাবার জিনিষ সাজানো, ঘর ঠাণ্ডা ব'লে কোন খাবার নষ্ট হয় না, বহুদিন ঠিক থাকে।

রান্নাঘরটিও কি চমৎকার, বড় লোহার উনান চক্ চক্ করছে। সব পরিষ্কার।

অজয়ের কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগত জাহাজের বেতার টেলিগ্রাফের ঘরখানা। সে ঘরটি খুব উঁচুতে, সেখান থেকে সমস্ত চক্রবাল দেখা যায়, সমুদ্রের চার দিকের বাতাস প্রবাহিত হয়। যে লোকটা শোনবার যন্ত্র কানে দিয়ে বসে থাকত তাকে দেখে অজয়ের হিংসা হ'ত — সবাইকে সারাদিন জল, শুধু জল দেখতে হয়, আর এ লোকটা জাহাজে বসে কত খবর শুনছে, কত কথা জানছে।

জাহাজে অজয় একটি নতুন বন্ধু লাভ করলে। রাইনহার্ড ব'লে এক খালাসীর সঙ্গে তার বড় ভাব হ'ল। রাইনহার্ডের বয়স বেশী নয়, সতেরো আঠারো হবে। উত্তর জার্ম্মান প্রদেশের কোন গ্রামে তার বাড়ী। তার বাবা, মা কেউ নেই, ছোটবেলা থেকে তার জাহাজে কাজ করবার সখ, বাড়ী থেকে আপত্তি করেছিল, কিন্তু সে পালিয়ে এসে জাহাজের কাজে ঢোকে। রাইনহার্ডের জীবনের সঙ্গে অজয়ের জীবনের অবস্থার কিছু কিছু মিল থাকার জন্যেই বোধ হয় তাদের বন্ধুত্ব গভীর হয়ে উঠল।

কিন্তু দুজনের চেহারায় বড় তফাৎ। রাইনহার্ড ছ-ফিট লম্বা. তার রং মার্ব্বেল পাথরের মত সাদা, চোখ দুটি গভীর নীল, সোনালী চুল, তার পাশে অজয়কে বেঁটে কালো দেখায়। কাজের অবসরে রাইনহার্ড অজয়ের সঙ্গে এসে কত গল্প করত, তার দেশের কথা নানা ভ্রমণের কথা বলত। ছেলেটি দেখতে লম্বা বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি মোটা, বড় সাধাসিধে মন, অজয়ের সঙ্গে দুষ্টামি বুদ্ধিতে পেরে উঠত না।

কিন্তু একদিন রাইনহার্ড কি কাণ্ড করেছিল! দুপুরবেলা অজয় ডেক-চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সমুদ্রের ফুরফুরে বাতাস আসছে, জাহাজ ধীরে ধীরে চলেছে, বেশ আরামে সে ঘুমোচ্ছিল, সহসা রাইনহার্ড এসে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তুলে বল্লে, — ওঠ, শীগগীর ওঠ, শীগগীর, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়।

অজয় বিস্মিত হয়ে একটু ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে বল্লে, — কি ব্যাপার!

রাইনহার্ড তার হাত টেনে বল্লে, — তোমার কেবিনে চল শীগগীর, শুনছো না বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা বাজছে, জাহাজের একটা কিছু ঘটেছে।

— কি? কি হয়েছে!

— তা কি ক'রে বলব? হয়ত কোথাও আগুন লেগেছে, বা জাহাজের তলা ফুটো হয়ে জল উঠছে, জাহাজ শীগগীর ডুবে

যেতে পারে — এখন লাইফ-বোটে চড়ে যত শীগগীর হয় এ জাহাজ ছাড়তে হবে, তোমার ক্যাবিনে চল, শীগগীর ছুটে এস।

— ক্যাবিনে কেন?

— ক্যাবিনে তোমার খাটের পাশে লাইফ-বেল্ট সাজানো আছে দেখেছ? সেই লাইফ-বেল্ট পরে লাইফ-বোটে নামতে হয়, ধর, যদি নৌকাটা ডুবেই যায় তবু সোলার সেই বেল্ট পরে থাকলে তুমি ডুববে না, সমুদ্রে ভেসে চলবে। চল শীগগীর, ওই দেখ, সবাই লাইফ-বেল্ট পরে এসে দাঁড়াচ্ছেন।

অজয় অবাক হয়ে দেখলে, সত্যি ত সবাই পিঠে বুকে কি একটা মোটা জিনিষ বেঁধে ডেকের ওদিকে এসে দাঁড়াচ্ছেন, ওই ত ফ্রাউ মায়ার, তাঁর পাশে লীনা, ওই ডাক্তার ফিসার, কিন্তু টোনি কই? সে বোধ হয় তাকে খুঁজছে! জাহাজের বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা বাজছে, খালাসীরা সামনের লাইফ-বোটটা নামাচ্ছে! সামনের দৃশ্যটা অজয়ের কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হ'ল। আগুন লেগেছে? না জাহাজ ফুটো হয়েছে? সত্যিই জাহাজ ডুবে যাবে? তারা নৌকাতে ক'রে ভেসে ভেসে চলবে, কতদিন পরে হয় ত কোন জাহাজে দেখতে পাবে, হয় ত পাবে না, হয়ত না-খেতে পেয়ে, বা সমুদ্রের ঝড়ে ——

অজয় হতাশের স্বরে বলে উঠল, — টোনি কোথায়?

রাইনহার্ড বল্লে, — সে লাইফ-বেল্ট পরে আসছে, তুমি শীগগীর এস।

ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে অজয় রাইনহার্ডের সঙ্গে চল্ল: ক্যাবিনে এসে রাইনহার্ড তাকে তাড়াতাড়ি লাইফ-বেল্টটা পরিয়ে দিলে।

অজয় বল্লে, — তোমার লাইফ-বেল্ট কোথায় ?

— আমি পরে আসছি, তুমি এখন ছুটে গিয়ে ডেকে সবার সঙ্গে দাঁড়াও গে।

— না, তুমি আমার সঙ্গে এস, দেরী করলে জাহাজ ডুবে যেতে পারে।

— আমার লাইফ-বেল্ট পরতে আবার নীচের তলায় যেতে হবে।

— চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

— না, না, তা হয় না, শুনছ না ঘণ্টা।

সৌভাগ্যক্রমে সে ক্যাবিনে আর একটা লাইফ-বেল্ট ছিল, রাইনহার্ড সেটি পরতে আরম্ভ করে দিলে, অজয় দু-তিনটে জিনিষ নিয়ে একটি পুঁটলি বাঁধলে।

রাইনহার্ড গম্ভীর ভাবে বল্লে,— ও সব পুঁটলি চলবে না, জাহাজের নিয়ম, কেউ কোন জিনিষ নিয়ে আসতে পারবে না, প্রত্যেকে যদি একটা পুঁটলি বেঁধে নিয়ে আসে, নৌকা কত ভারী হবে, আর জায়গাই বা কোথায় ?

তা বটে ! অজয় শুধু তার মা'র ফটোটি পকেটে পুরলে, তারপর ছুটে রাইনহার্ডের সঙ্গে ডেকে গেল।

ডেকে সবাই সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে, কাপ্তেনসাহেব তাদের
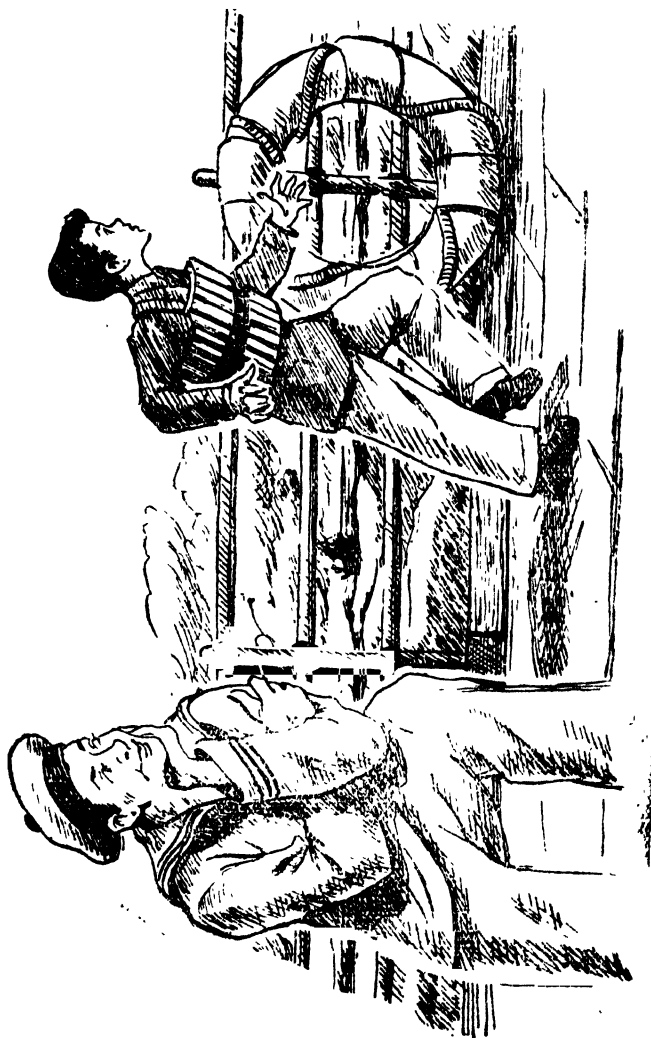
সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন, এ যেন কোন জেনারেল সৈন্যদের পরিদর্শন করছেন।

কাপ্তেনসাহেব বল্লেন,— অজয়, তোমার বড্ড দেরী হয়ে গেছে, দাঁড়াও টোনির পাশে।

অজয়ের বুক দুলছে, মুখ ফ্যাকাশে, সে টোনির পাশে দাঁড়িয়ে বল্লে,— টোনি, তোমায় খুঁজছিলুম। কি, আগুন? না, ফুটো?

কথাটা বুঝতে না পেরে টোনি প্রথমে অবাক হয়ে চাইল, তারপর মুচকে হেসে উঠল। মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে এ রকম হাসাটা অজয়ের প্রথম ভাল লাগল না। ও, টোনি দেখাচ্ছে সে বীর, সে সমুদ্রে একটি ছোট নৌকা নিয়ে ভাসতে ভয় করে না। অজয়ও করে না। অজয় একটু জোর ক'রে হেসে বল্লে,— এ বেশ নতুন য়্যাড্‌ভেন্‌চার হবে, জাহাজে জীবনটা কি রকম একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল।

টোনি গম্ভীর ভাবে বল্লে, — হাঁ, তা বটে।

লাইফ-বোট নামানো হয়েছে, সিঁড়িও নামানো হ'ল, ডাক্তার ফিসার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে অজয় গম্ভীর ও ক্ষুব্ধভাব বলে উঠল, — আগে মহিলারা ও ছোট ছেলেমেয়েরা নামবে ডাক্তার ফিসার!

অজয়ের মুখের ভাব দেখে ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে প্রথমে সবাই চমকে উঠল, তারপর হেসে উঠল।

এর মধ্যে হাসির কি আছে! এরা ত বড় মজার মানুষ দেখি। তারপর কাপ্তেন সাহেব হেসে বল্লেন, — আচ্ছা, বেশ হয়েছে, এখন সবাই যেতে পার।

তিনি নীচে নেমে গেলেন, আবার সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, তখন অজয় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। জাহাজে তাহ'লে আগুন লাগেনি! সে টোনির দিকে চেয়ে বল্লে, — টোনি! আগুনটা বুঝি নিভে গেছে?

টোনি হেসে বল্লে, — হ্যাঁ, সে ত বহুক্ষণ নিভে গেছে। তবে আবার জ্বলে উঠতে পারে।

অজয়ের অবস্থাটা সবাই উপভোগ করছিল, কিন্তু ফ্রাউ মায়ারের করুণা হ'ল; তিনি অজয়ের হাত ধ'রে নিজের কাছে টেনে এনে বল্লেন,— ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অজয়, জাহাজে আগুন লাগেনি, জাহাজের তলাও ফুটো হয় নি। তবে কোন দুর্ঘটনা ঘ'টে যদি জাহাজ-ডুবীর সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে কি রকম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইফ-বোটে নেমে জাহাজ ছাড়া যেতে পারে সেটি অভ্যাস করবার জন্যে মাঝে মাঝে বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা বাজিয়ে লাইফ-বেল্ট পরিয়ে ড্রিল করানো হয়, বুঝলে!

— হ্যাঁ, বুঝলুম কিন্তু রাইনহার্ড কোথায়?

রাইনহার্ড! রাইনহার্ড তখন একেবারে জাহাজের তলায় পালিয়েছে; সেদিন অজয় আর তার টিকি (অবশ্য কোন জার্ম্মান নাবিক মাথায় টিকি রাখে না) দেখতে পেলে না। পরদিন

অজয়ের রাগ পড়লে রাইনহার্ড এসে বল্লে, --- ক্ষমা কর অজয়।

অজয় হেসে বল্লে, — ক্ষমা কিসের, তুমি ত কোন দোষ কর নি! ধর, সত্যি যদি কোন দুর্ঘটনা ঘ'টে জাহাজ-ডুবীর সম্ভাবনা হ'ত, আমি ত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতুম।

দুই বন্ধুতে আবার মিলন হ'ল।

জাহাজের দিনগুলি সুখে কেটে যেতে লাগল, হাস্যে গল্পে খাওয়ায় খেলায় নিদ্রায় দিনরাত স্বপ্নের মত চ'লে গেল; পোর্ট সৈয়দ পার হয়ে জাহাজ যেদিন ভূমধ্যসাগরে পড়ল অজয়ের বুক নেচে উঠল; ইয়োরোপের মাটিকে তখনও দেখতে পায় নি বটে কিন্তু ইয়োরোপের সাগরের জলকে দেখে মন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল।

ছয়

ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে বিস্কে উপসাগরে পাড়ি দিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে দোলা খেয়ে জাহাজখানি ইংলণ্ডের একটি বন্দরে এসে নোঙর ফেলেছে। কিছু তুলোর বস্তা ইংলণ্ডে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

ভোর বেলা যখন ইংলণ্ডের কূল দেখা গেল অজয় ডেকে লাফাতে আরম্ভ ক'রে দিল। তার ইচ্ছে হ'ল তখনই ডাঙ্গায় বেড়িয়ে আসে। কিন্তু কাপ্তেনসাহেব বল্লেন,—দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে তীরে নামা যাবে।

অজয়ের মন দমে গেল। জল দেখে দেখে তার অরুচি হয়ে গেছে; ভূমির সঙ্গে তার যে কি গভীর টান, মাটিকে সে যে কত ভালবাসে তা এই কূল দেখে সে বুঝতে পারলে, তার উপর ইংলণ্ডের মাটি।

ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার পর ডাঙায় নেমে যেতে তার মন ছটফট করতে লাগল, চোখের সামনে ইংলণ্ড, সে নামতে পারছে না! তার আর ধৈর্য্য রইল না। টোনি লীনা তুলোর বস্তা নামানো দেখছিল, অজয় রাইনহার্ডের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে চুপে চুপে রাইনহার্ডের দেহের আড়ালে ডাঙায় নেমে গেল; রাইনহার্ড তাকে সামনের এক বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে এল, এখন মাল নামানো হচ্ছে, তার অনেক কাজ।

বন্দরের বড় রাস্তা ধ'রে অজয় এগিয়ে চল্ল ! চারিদিকে অবাক হয়ে চাইতে লাগল কিন্তু দেখল, অবাক হবার বিশেষ কিছু নেই। দ্বিজু রায় যে ব'লে গেছেন, বিলেত দেশটা নেহাৎ মাটির, তা সত্যি। সেই কলকাতার মতন সিমেণ্টের ফুটপাথ, কালো পিচে মোড়া রাস্তা, বাসগুলো কলকাতার বড় দোতালা বাসগুলোর মত, লোক বোঝাই ছুটছে; তবে ট্রামগুলো দোতালা। দুধারে লাল ইটের বাড়ীর সারি ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, বাড়ীগুলি সবই এক রকম উঁচু; সামনে থেকে ঠিক এক রকম দেখতে, একেবারে একঘেয়ে, এক বাড়ীর সঙ্গে আর এক বাড়ীর বড়-একটা তফাৎ নেই। তবে রাস্তা খুব পরিস্কার তক্‌তক্‌ করছে, কোথাও একটু কাগজের টুকরোও পড়ে নেই। লোকজন তো চলছে না, ছুটছে, সবাইকে যেন ট্রেন ধরতে হবে। অজয়ের পায়েতেও এই চলার গতির ছোঁয়াচ লেগে গেল; ঢিমে তেতা-লায় যাওয়াটা যেন এদেশে অন্যায়, হাস্যকর ব্যাপার, সবাই জীবন্ত, প্রাণ উপচে পড়ছে।

এরকম হন্‌হন্‌ ক'রে বড় রাস্তা দিয়ে চলতে অজয়ের বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। সে পাশের একটি সরু রাস্তা দিয়ে চল্ল। রাস্তাটি জনবিরল, দুধারে বাড়ীগুলি এক রকম দেখতে, তবে কাচের জানলায় পর্দ্দার রং আলাদা। সন্ধ্যাবেলায় নিজের বাড়ী ঠিক চিনে ঢোকা মুস্কিলের কথা।

— হ্যালো ব্ল্যাকি।

আহ্বান শুনে অজয় চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে দেখে রাস্তার ওদিকে ফুটপাথে একদল ইংরেজ ছেলে, তাদের মধ্যে কয়েকজন বিদ্রূপের স্বরে চেঁচাচ্ছে,— হ্যালো ব্ল্যাকি।

অজয় একবার কটমট ক'রে তাদের দিকে তাকাল, তারপর হনহন্ ক'রে চলতে লাগল। অজয় তাদের অগ্রাহ্য ক'রে চল্ল দেখে কয়েকটি ছেলে, ব্ল্যাকি! ব্ল্যাকি! বলে তার পেছন ছুটে এল।

ব্ল্যাকি! কালা আদমি! হাঁ, তার রং কালো, সে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জন্মেছে, তাই চামড়ার রং শীত প্রধান দেশের লোকের মত সাদা নয়, তাতে বিদ্রূপের ব্যঙ্গের কি আছে?

অজয়ের মাথা গরম হয়ে উঠল, সে রুখে দাঁড়াল। যে ছেলেগুলি 'ব্ল্যাকি' 'ব্ল্যাকি' বলে তার পেছন পেছন ছুটে ছুটে আসছিল তারা অজয়ের কাছে এসে থেমে গেল, তার মুখের ভাব দেখে চুপ ক'রে দাঁড়াল। অজয় রেগে বলে উঠল,— What d'y'u want! অর্থাৎ তোদের কি চাই?

একটা ছেলে ঠাট্টার সুরে বল্লে, I say, Blackie, you come from Africa, অর্থাৎ ওহে কালা আদমি, তুমি আফ্রিকা থেকে আসছ! অজয় দীপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠল,—No, I come from India, না, আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি।

একটা মোটা ছেলে হেসে ব'লে উঠল,— Oh! That's same. You are a Blackie. ও! সে একই কথা, তুমি ত কালা আদমি, কাফ্রি!

ছেলেদের ভূগোল জ্ঞান ত টনটনে। অজয় কিন্তু রাগে কাঁপতে লাগল। তার রং কালো ব'লে তার দেশকে, তার জাতকে এরা অপমান করবে! ঘুসি বাগিয়ে সে মোটা ছেলেটির দিকে এগিয়ে গেল,— Come on, fight! চলে আয়, যুদ্ধং দেহি!

কালা আদমিটি যে এরকম রেগে রুখে দাঁড়িয়ে মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করবে, তা কেউ ভাবেনি, মোটা ছেলেটি একটু পেছিয়ে গেল, কিন্তু সে যখন বক্সিংএ চ্যালেঞ্জ করেছে, তখন পিছনোও যায় না, ছেলের দল এসে জমেছে; অজয় তার টুপি ও জামা খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে মুষ্টিযুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়াল, বন্ধুদের প্ররোচনায় মোটা ছেলেটিও ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে গেল, রাস্তার মাঝে বক্সিং লড়ার ভূমি হ'ল, সব ছেলেরা ঘিরে দাঁড়াল।

অজয় কলকাতায় তাদের পাড়ার কিশোর-সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য ছিল; যতীনদা'র কাছে নিয়মিত ভাবে বক্সিং শিখেছে, পাড়ার কোন ছেলে তার সঙ্গে বক্সিং-এ পেরে উঠত না। তার ওপর ব্ল্যাকি ব'লে তাকে বিদ্রূপ করায় সে ভয়ঙ্কর রেগে গিয়েছিল, ইংরেজ ছেলেটি ঘুসি পাকিয়ে আসতেই সে তার এক গালে এমন একটি ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, ছেলেটি চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে টলতে টলতে রাস্তায় পড়ে গেল, তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি ক'রে পেছনে টেনে নিলে।

অজয় চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, — Come on, who next ! চলে আয়, আর কে লড়বি !

যে ছেলেটি অজয়কে বলেছিল, তুমি আফ্রিকা থেকে আসছ, তাকেই এগিয়ে যেতে হ'ল। কিন্তু সে বক্সিং-এ আনাড়ি। দু-মিনিটে অজয় তাকে হারিয়ে দিলে !

তারপর একজন লম্বা ছিপছিপে ছোকরা এগিয়ে এল। স্কুলের মধ্যে ভাল মুষ্টিযোদ্ধা ব'লে তার নাম আছে। সে আগে লড়তে আসেনি, তার কারণ সে দেখছিল অজয় কি ভাবে লড়ে, তার লড়াইয়ের কায়দা বুঝতে পারলে শীগগীর তাকে হারাতে পারা যাবে। অনেকক্ষণ ধ'রে অজয়ের সঙ্গে তার ঘুসোঘুসি চল্ল, নাকে কপালে অজয় দু-একটা ঘুসিও খেলে, চারিদিকে লোক জমে গেল, পথের দু-পাশে বাড়ীর দরজা-জানালা খুলে মেয়েরা দেখতে লাগল; ছেলেরা অবশ্য তাদের বন্ধুকে cheer up করতে লাগল, কিন্তু পথের কোন কোন মেয়ে অজয়কেও cheer up করলে। দুজনকে হারিয়ে হেরে যাবে ! কথাটা মনে হতেই অজয় ধাঁ ক'রে সেই লম্বা ছেলেটার রগে এমন এক ঘুসি দিলে যে, সে টলতে লাগল, আর এক ঘা দিতেই সে রাস্তায় বসে পড়ল। তিন জনকে সে হারিয়েছে, এবার ছেলেরা 'ব্ল্যাকি' বলবার জন্যে নিশ্চয় দুঃখ প্রকাশ করবে।

হঠাৎ তিনটে ছেলে এক সঙ্গে ঘুসি পাকিয়ে অজয়ের দিকে

ছুটে এল, ডালকুত্তার মত তার ঘাড়ে গিয়ে পড়লো ; সহসা এ রকম আক্রমণের জন্য অজয় প্রস্তুত ছিল না, এক সঙ্গে তিন জন ! কিন্তু সে পিছোল না ; নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে দাঁড়াল, তার হাত ঝন্‌ঝন্‌ করছে, পা কাঁপছে, সে পরিশ্রান্ত, একদমে তিনজনের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। তার পা কেমন মচ্‌কে গেল, সে একটা ছেলের বুকে একটা জোর ঘুসি দিলে বটে, কিন্তু পা মচ্‌কে যাওয়াতে টলে রাস্তায় পড়ে গেল ; যদি রাস্তায় পিচের ওপর পড়ত তাহলে বোধ হয় অত লাগত না, কিন্তু অজয়ের মাথা পড়ল ফুটপাথের পাথরের ওপর ; বেশ জোড়েই পড়ল, মাথা ফেটে রক্ত পড়তে লাগল !

ব্যাপারটা, নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। এক সঙ্গে তিনজন মিলে একজন বিদেশী বালককে আক্রমণ করছে দেখে রাস্তার অনেকেই চেঁচিয়ে উঠছিল, — শেম্! শেম্। ছি ! ছি !

যারা অজয়কে আক্রমণ করেছিল তারা বিশেষ লজ্জিত বোধ করলে, বস্তুত তিন জনে মিলে ঘুসি মেরে অজয়কে হারাবে, তাদের ইচ্ছা মোটেই ছিল না ; ফাঁকি দিয়ে তারা জিততে চায়নি ; কিন্তু তাদের দলের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার হার হ'ল দেখে তারা এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, এক সঙ্গেই ছুটে লড়তে এসেছিল। অজয়কে এ রকম ভাবে পড়ে যেতে দেখে তারা সমস্বরে বলে উঠল, — Sorry, awfully sorry. দুঃখিত। একটি ছেলে তার রুমাল বার ক'রে অজয়ের মাথায় ক্ষতের

ওপর চেপে ধরল, রক্ত থামান যাচ্ছে না, কিন্তু অজয় তখনও ঘুসি ছুঁড়ছে !

ডাক্তার ! ডাক্তার ! সবাই চেঁচিয়ে উঠল।

একটি দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ ভিড় ঠেলে অজয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন, — ছেলেরা সর, আমি ডাক্তার।

ডাক্তারকে দেখে ছেলেমেয়েরা সব স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল : তাদের জন্যে এক বিদেশী ছেলের বিপদ হ'ল। ছেলেটি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, আর হাত ছুঁড়ছে না। বিশেষত এক সঙ্গে তিনজন মিলে তাকে আক্রমণ করেছে বলে সবাই লজ্জিত ব্যথিত। কালো রং বলে তারা 'ব্ল্যাকি' বলে ডেকেছে, তারা বিদ্রূপ বা অপমান করতে চায় নি।

ডাক্তার বল্লেন, — এ কার সঙ্গে এসেছে ?

এ বিদেশী ছেলেটির কি নাম, কার সঙ্গে এসেছে কোথায় থাকে, তা কেউ বলতে পারল না। ওসব খোঁজ-খবর করবার সময় নেই, শীগগীর অজয়ের চিকিৎসা হওয়া দরকার। ডাক্তারটি তাড়াতাড়ি অজয়ের সংজ্ঞাহীন দেহ পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিজের মোটরে নিয়ে গিয়ে তাকে শুইয়ে দিয়ে সোফারকে বল্লেন,— শীগগীর হোটেলে চল। হাসপাতালে যেতে তাঁর ইচ্ছে হ'ল না। এ ছেলেটির নাম কি, কোথায় থাকে, কি ক'রে মাথা ফাটল, কোথায় মারামারি হ'ল — এসব নানা প্রশ্নে তাকে সবাই ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে, পুলিশ আসবে। পুলিশকে

তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

একটি ছোট মেয়ে অজয়ের কোট টুপি রাস্তা থেকে তুলে মোটরের দিকে ছুটল — ডাক্তার, কোট। টুপি।

মোটর তখন রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে গেছে, অজয়ের কোট ও টুপি পড়েই রইল।

এদিকে সেদিন সন্ধ্যায় জাহাজে হুলুস্থুল পড়ে গেল। অজয় সেই সকালে গেছে, এখনও ফেরেনি, কি হ'ল তার? কাপ্তান মায়ার ছু-তিন বার পুলিস-আফিসে গেলেন, পুলিসের লোক কিছুই খবর দিতে পারল না।

এদিকে মাল সব নামান হয়ে গেছে, পরদিন ভোরে জাহাজ জার্ম্মানীতে চ'লে যাবে। ফ্রাউ মায়ার স্বামীকে বার বার বল্লেন, — একটা দিন থেকে যাও। কাপ্তান মায়ার বল্লেন, — অসম্ভব, জার্ম্মানী থেকে ছু'খানা জরুরি বেতার এসেছে; যত শীগগীর সম্ভব পৌঁছতে হবে, পথে তিন দিন দেরী হয়ে গেছে। অনেক অনুরোধে পরদিন সকালটা পর্য্যন্ত দেখে যেতে তিনি রাজী হলেন।

সে রাত্রে মায়ার-পরিবারে কেউ ঘুমাল না। বেচারা রাইনহার্ড! সে সেই রাত্রে কিছু খেতে পারলে না, সারারাত জাহাজের সিঁড়ির কাছে বসে রইল, সে যে অজয়কে বন্দরে নামতে সাহায্য করেছিল তার জন্যে অনুশোচনায় সে কেঁদে ফেল্ল। সে কাপ্তানের কাছে গিয়ে বল্লে ,— জাহাজ চলে যাক্;

সে বন্দরে থাকবে, অজয়কে সঙ্গে না নিয়ে সে দেশে ফিরবে না ;

কাপ্তেন তাকে খুব জোরে এক বকুনী দিলেন। পরদিন সমস্ত সকাল গেল, দুপুর গেল, অজয়ের কোন খবর মিলল না। কাপ্তেন মায়ার, ফ্রাউ মায়ার, ডাক্তার ফিসার সবাই প্রতি ঘণ্টায় একবার থানায় খোঁজ নিয়ে এলেন, পুলিস সারা সহর খুঁজছে, কোন সন্ধান পায়নি।

শীগগীর চলে আসবার জন্যে আবার একখানা বেতার আদেশ হামবুর্গ থেকে বিকেলে এল। আর জাহাজ আটকে রাখা যায় না। অজয়কে অন্য জাহাজে ক'রে পাঠাবার জন্য টাকা জমা দিয়ে, নিজের ঠিকানা দিয়ে কাপ্তেন মায়ার বন্দরের বড় থানা থেকে এলেন। যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তক্ষুনি যেন বেতারে জানান হয়।

জাহাজের নোঙর তোলা হ'ল, ফ্রাউ মায়ার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, টোনি কাঁদতে লাগল। লীনাও চেঁচাতে লাগল, — অজয়কে ছেড়ে যাব না।

জাহাজ জার্ম্মানীর দিকে চল্ল।

অজয় তখন ডাক্তার ইয়েট্সের শোবার ঘরে স্নিগ্ধ শয্যার ওপর ১০৪ ডিগ্রি জ্বরে বেঘোরে ভুল বক্‌ছে,—টোনি, তকলি,··· লাগাও ঘুসি।

সাত

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ হচ্ছেন একজন আইরিশ ডাক্তার, ডবলিন্ শহরে তাঁর বাড়ী। তার বাবাও বড় ডাক্তার ছিলেন, অনেক টাকা রেখে গেছেন। ইয়েট্‌স্ সে জন্যে আর ডাক্তারী বড় করেন না ; ফটো তোলা আর এরোপ্লেনে নানা দেশ ঘোরা হচ্ছে তাঁর প্রধান দুই সখ। তিনি আবার নিজের দেশের স্বাধীনতাকামী ডি, ভ্যালেরার দলের ; আয়ারল্যাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়, এই তাঁর ইচ্ছা।

তিনি নিজের ছোট এরোপ্লেন ক'রে আয়ারল্যাণ্ড থেকে জার্ম্মানীতে যাচ্ছিলেন, পথে এরোপ্লেনের কল খারাপ হয়ে যাওয়াতে তাঁকে ইংলণ্ডের এই বন্দরে নামতে হয়েছে। এরোপ্লেনটি কতদূর সারান হ'ল, সকালে তাই দেখতে বার হয়েছিলেন, পথে দেখলেন ছেলেদের একটা মারামারি চলছে, ব্যাপার কি দেখতে মোটরগাড়ী থেকে নামলেন। একটি বিদেশী ছেলে সবাইকে ঘুসি-যুদ্ধে হারিয়ে দিচ্ছে, তারপর তিনজনের অন্যায় আক্রমণে অজয় যখন পথে পড়ে গেল, তিনি ছুটে গেলেন, অজয়কে নিজের মোটরগাড়ীতে তুলে নিয়ে হোটেলে এলেন, নিজের বিছানায় শুইয়ে রীতিমত শুশ্রূষা আরম্ভ করলেন।

অজয়ের যখন প্রথম জ্ঞান হ'ল, সে অবাক হয়ে চেয়ে

দেখলে এক অজানা ঘরে সাদা ধপধপে বিছানায় সে শুয়ে, তার মাথার কাছে এক অপরিচিতা নারী বসে, তাঁর সাজ মেডিক্যাল কলেজের নার্সদের মত। এ কি! তার মাথায় পাগড়ির মত ব্যাণ্ডেজ জড়ান। অজয় ভগ্নস্বরে বলে উঠল,— আমি কোথায়? সে উঠে বসতে চেষ্টা করল। নার্সটি তাড়াতাড়ি তাকে শুইয়ে দিয়ে বল্লেন, — তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাক, ভয় নেই, তুমি বন্ধুদের মধ্যে।

অজয়ের মাথাটা ব্যথা ক'রে উঠল, সে চুপ ক'রে শুয়ে, ভাসাভাসা চোখে চারিদিকে চাইলে। তাদের গলার স্বর শুনে ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন, অজয়ের হাতখানি নিজের হাতে ধ'রে আদর ক'রে বল্লেন, — শান্ত হয়ে শুয়ে থাক; আমি ডাক্তার, তোমাকে পথ থেকে নিয়ে এসেছি, তুমি আমার ঘরে আছ।

অজয় অবাক হয়ে ডাক্তার ইয়েট্‌সের দিকে চাইল। 'পথ' কথাটা কানে যেতেই তার সব কথা মনে পড়ে গেল, জাহাজ ছেড়ে বার হওয়া, পথে মারামারি, ঘুসি-যুদ্ধ। সে চঞ্চল হয়ে ব'লে উঠল,— আমি জাহাজে যাব, শীগগীর জাহাজে ফিরতে হবে আমায়। আমায় শীগগীর জার্ম্মান জাহাজে রেখে আসুন।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ ধীরে বল্লেন, — জাহাজে? তুমি কি জাহাজে ক'রে এসেছ? কোন্‌ জাহাজে, বল, আমি সেখানে এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি।

অজয় আবেগের সঙ্গে বিছানেতে উঠে বসল, নার্স ও তাকে স্থির ক'রে শুইয়ে রাখতে পারলেন না। সে হাত নেড়ে কম্পিত-কণ্ঠে বল্লে, — আমার নাম অজয়কুমার ; আমি জার্ম্মান জাহাজ 'বার্লিন' থেকে শহরে বেড়াতে বার হয়েছিলুম — 'বার্লিন', কাপ্তেন মায়ার তার কাপ্তেন — তার সঙ্গে আমি বাংলা থেকে আসছি — জাহাজ হামবুর্গে যাচ্ছে — জার্ম্মান 'বার্লিন' !···

আর সে বলতে পারলে না, শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার ইয়েট্স্ অজয়ের প্রতি কথা অতি আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলেন। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে বন্দরের অফিসে টেলিফোন করলেন। অফিসের লোকেরা জানালে, সেদিনই বিকালে 'বার্লিন জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেছে ! হ্যাঁ, সে জাহাজ থেকে একটি বাঙ্গালী ছেলে শহর দেখতে বার হয়েছিল, আর ফেরেনি ! জাহাজের কাপ্তান ব'লে গেছেন বটে, তার কোন সন্ধান পাওয়া গেলে যেন বে-তারে জানানো হয়।

ডাক্তার ইয়েট্স্ তক্ষুনি 'বার্লিন' জাহাজে বে-তারে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন ; তিনি জানালেন যে, অজয় তাঁর কাছে নিরাপদে আছে, তাকে যত শীঘ্র সম্ভব হাম্‌বুর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

তারপর তিনি অজয়ের ঘরে এসে তার হাত ধ'রে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন, — দেখ অজয়, তোমার জাহাজ এ বন্দর ছেড়ে হাম্‌বুর্গের দিকে চ'লে গেছে। তোমার কুশলসংবাদ দিয়ে আমি সে জাহাজে

বে-তার বার্ত্তা পাঠিয়েছি। তুমি কিছু ভেব না; তুমি সেরে উঠলেই আমি নিজে তোমাকে হাম্‌বুর্গে পৌঁছে দিয়ে আসব।

অজয় করুণ নয়নে ডাক্তার ইয়েট্‌সের দিকে চাইল, তার দুই চোখ জলে ভ'রে এল; কি কুক্ষণেই সে জাহাজ ছেড়ে বার হয়েছিল, ফ্রাউ মায়ার, টোনি না-জানি তার জন্যে কত ভাবছে, আর সে রইল অজানা ইংলণ্ডে! সেখানে ত সবাই তাকে 'ব্ল্যাকি' বলে, আর তার জাহাজ চলে গেছে। সে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ল।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ তার হাত ধ'রে বল্লেন, — অজয়, শান্ত হও তুমি আমাকে বন্ধু বলে জেনো। আমি শুধু ডাক্তার নই, আমি এরোপ্লেন-চালক; আমার নিজের এরোপ্লেন করে আমি জার্ম্মানী যাব, সেই এরোপ্লেনে তোমাকে হামবুর্গে পৌঁছে দিয়ে আসব, তুমি হয়ত জাহাজের অনেক আগেই গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তার আগে ভাল করে সেরে ওঠা চাই, তোমার এখনও জ্বর রয়েছে, এখন অধীর হ'লে জ্বর ত ছাড়বে না।

এই অপরিচিত ডাক্তারটি এরোপ্লেনে ক'রে তাকে হামবুর্গে পৌঁছে দিয়ে আসবেন! সে কি স্বপ্ন দেখছে! না, ইংলণ্ডের লোকেরা খারাপ নয়। এরোপ্লেনে চড়ার কথা শুনে তার মন কিছু শান্ত হ'ল। সে ডাক্তার ইয়েট্‌সের হাত ধ'রে বল্লে,— অশেষ ধন্যবাদ ডাক্তার। তারপর চুপচাপ শুয়ে রইল।

পরের দিন অজয়ের জ্বর গেল, তার মাথার ঘাও প্রায়

শুকিয়ে এল। তারপর দিন সে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল, তারপর দিন সে ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌কে রীতিমত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্লে, — কৈ ডাক্তার, কৈ তোমার এরোপ্লেন, চল শীগগীর জার্ম্মানীতে এরোপ্লেনে ক'রে।

এদিকে ডাক্তারের এরোপ্লেন এখনও সারানো হয়নি; বন্দরের মিস্ত্রিরা ঠিক সারাতে পারবে না, লণ্ডন থেকে মিস্ত্রি পাঠাতে তিনি টেলিগ্রাফ করলেন। অজয়কে বল্লেন, — এরোপ্লেন সারানো না হ'লে কি করে যাওয়া যায়! অজয়কে নিয়ে গিয়ে তাঁর এরোপ্লেন দেখিয়ে নিয়ে আসলেন, তবে অজয় শান্ত হ'ল।

লণ্ডনের মিস্ত্রি এসে বল্লে, — এ এরোপ্লেন ভাল ক'রে সারাতে কিছুদিন সময় লাগবে, তবে হামবুর্গটুকু যাবার মতন জোড়তাড় দিয়ে দিতে একদিনেই হয়ে যাবে। ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ বল্লেন, — তাই ক'রে দাও।

সেদিন অজয় সকালে উঠে শুধু ভাবছিল — জাহাজ হামবুর্গে পৌঁছেছে, ফ্রাউ মায়ার, টোনি, নীলা সবাই জাহাজ থেকে নেমে কি মজাই করছেন! আর সে এখানে একা পড়ে। তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। এমন সময় ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ হাসতে হাসতে ঘরে এসে অজয়কে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লেন, — অজয় শীগগীর তৈরী হয়ে নাও, আজ ব্রেকফাষ্ট খেয়েই আমরা এরো-প্লেনে ক'রে বার হয়ে পড়ছি। এখান থেকে হাম্‌বুর্গ ঘণ্টা

কয়েকের পথ; আজ বিকেলেই তুমি মায়ার-পরিবারের সঙ্গে ব'সে চা খাবে। ফ্রাউ মায়ারের হাতে চুমো খেতে পারবে।

ভাবতে তার চোখে জল এল! সে উৎসাহের সঙ্গে লাফিয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল,—আমি তৈরী! এক্ষুনি চলুন।

এরোপ্লেনে চড়ে যাবার জন্যে আলাদা সাজ-সজ্জা তার জন্যে কেনা হয়েছিল, সে সেগুলি তাড়াতাড়ি পরতে ছুটল।

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে যখন অজয় ডাক্তার ইয়েট্‌সের সঙ্গে এরোপ্লেনে চড়ে ইংলণ্ডের তীর ছাড়িয়ে অশান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে মেঘলোকের মধ্য দিয়ে মেল ইঞ্জিনের বেগে জার্ম্মানীর দিকে চল্ল, সে মনে মনে তার ভবিষ্যৎ ঠিক ক'রে নিলে — সে এরোপ্লেন চালক হবে, এরোপ্লেন ক'রে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করবে।

আট

নীলাকাশের মধ্যে দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে চল্ল। যেন একটা পাখী, দু'ডানা মেলে লীলায়িত গতিতে মনের আনন্দে চলেছে; কখনও সমুদ্রের জলের কাছাকাছি নেমে আসছে; নীলসিন্ধু শুভ্র-তরঙ্গের বাহু মেলে তাকে ধরতে যাচ্ছে; কখনও বা উৰ্দ্ধে মেঘ-লোকের মধ্যে উঠে যাচ্ছে, মেঘদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে চলেছে।

এরোপ্লেন ক'রে যাবে ভেবে অজয়ের মনে খুব আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু এরোপ্লেনে চড়ে তার মনের আনন্দ বেশীক্ষণ রইল না। তারা যখন ইংলণ্ডের উপকূল ছেড়ে চল্ল তখন আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যালোকে সমুদ্র ঝল্‌মল্; কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে আকাশ ঘোলাটে হয়ে এল, ঝড়ের মত হাওয়া বইতে লাগল, এরোপ্লেন কেঁপে কেঁপে যতই বেগে অগ্রসর হতে লাগল অজয়ের মাথা ততই দুলতে লাগল, গা বমি-বমি করতে লাগল, এরোপ্লেনে যাওয়া মোটেই সুখকর মনে হ'ল না।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ জিজ্ঞেস করলেন,— কেমন লাগছে অজয়? অজয় দাঁতে দাঁত চেপে মুখ লাল ক'রে ব'সেছিল, সে কোন রকমে একটি কথায় উত্তর দিল — ভাল।

কিন্তু ডাক্তার ইয়েট্‌স্ অজয়ের মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, অজয়েয় মোটেই ভাল লাগছে না। বেচারা! এরোপ্লেনে চড়বার

সখ আছে কিন্তু এদিকে মাথা ঘুরছে, বমি-বমি ভাব। তিনি ধীরে বল্লেন, — প্রথম এরোপ্লেনে চড়লে সবারই শরীরটা ভাল বোধ হয় না, তার ওপর তুমি আবার সদ্য অসুখ থেকে উঠেছ। আচ্ছা, ওই হ্যাণ্ডব্যাগটা খোল, একটা ওষুধ দেখিয়ে দিচ্ছি, খাও।

ওষুধটা খেয়ে অজয়ের শরীরটা একটু ভাল বোধ হ'ল। সে একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, সাগরের ঢেউগুলো দৈত্যের মত দাপাদাপি করছে, দেখেই মাথাটা তার আবার যেন গুলিয়ে গেল ; সে বল্লে, — আমরা খুব জোরে যাচ্ছি, না ?

ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ হেসে বল্লেন, — না, তুমি প্রথম এরোপ্লেন চড়েছ বলে তাই মনে হচ্ছে, আমি খুব আস্তেই যাচ্ছি, তুমি নীচের দিকে চেয়ো না।

কোন দিকেই চাইবার অজয়ের ইচ্ছা করছিল না ; সে চোখ বুজে বসে রইল, তার মনে হতে লাগল যেন একটা ধূমকেতু বা খসে-পড়া তারার মত সে অসীম শূন্য দিয়ে ছুটে চলেছে, এই যাওয়ার গতিকে সে দেহ-মন দিয়ে অনুভব করতে লাগল।

— অজয়, দেখ, আমরা সমুদ্র পার হয়ে ডাঙার ওপর দিয়ে চলেছি। জার্ম্মানীতে এসে পৌঁচেছি, দেখ রাইন নদী কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে !

ডাঙার নাম শুনে অজয় খুশীর সঙ্গে চোখ মেলল। কিন্তু ডাঙা কোথায় ? তারা যে আকাশে শূন্যে ছিল, সেখানেই
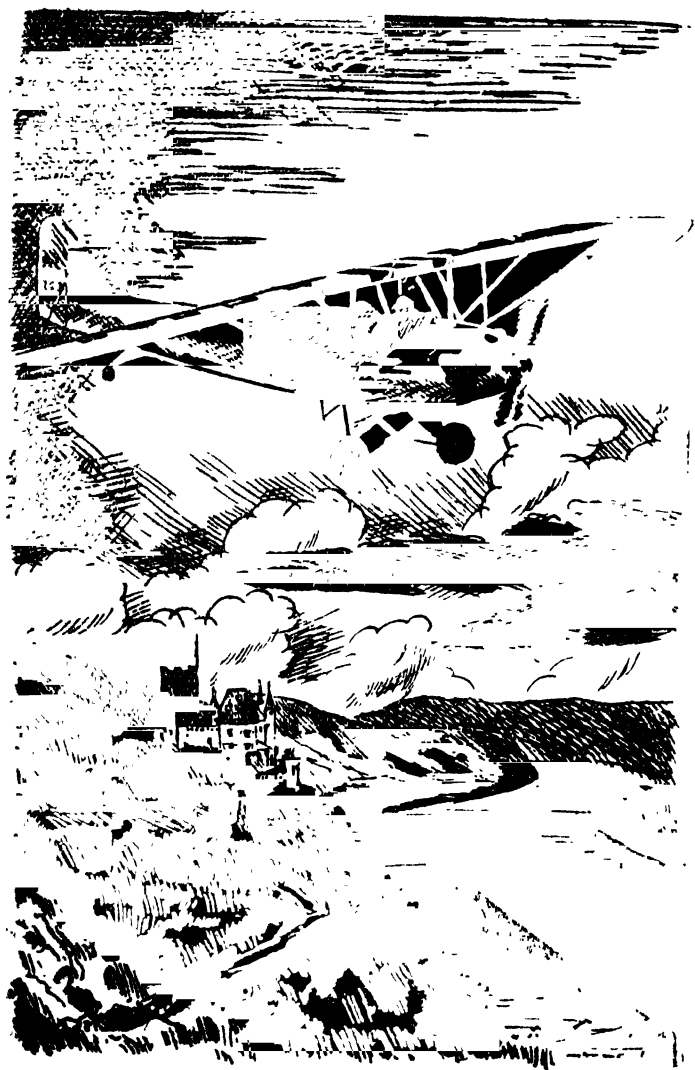
রয়েছে ; তবু নীচে সমুদ্র নয়, শক্ত জমি আছে এই ভেবে একটু আশ্বস্ত হয়ে সে নীচে চাইল। একটি ছোট শহর দেখা যাচ্ছে — যেন দেশলাইয়ের বাক্সের তৈরী খেলাঘরের গ্রাম, তার পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে রাইন নদী বয়ে গেছে রূপোর সুতোর মত। চারিদিক ঝাপসা, কুয়াসা করেছে, সেই কুজ্ঝটিকার আবরণের মধ্য দিয়ে সহর নদী পাহাড় মাঠ অস্পষ্ট স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ বল্লেন,— তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তোমায় আমি ঘুমোবার ওষুধই দিয়েছিলুম। হল্যাণ্ড তোমার দেখা হ'ল না, কত উইণ্ড-মিলের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে এলুম — ওই দূরে যে শহর দেখছ, ওই হচ্ছে কোল্‌ন্। ওই কোল্‌ন্ গির্জ্জে শতাব্দীর সাধনায় তৈরী।

ঘুমিয়ে অজয়ের শরীরটা অনেকটা চাঙা হয়ে উঠল ; সে উৎসাহের সঙ্গে চারিদিক দেখতে লাগল। বল্লে, — ডাক্তার ইয়েট্‌স্, একটু আস্তে চালান, শহরটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, গির্জ্জেটা বেশ বড়ই মনে হচ্ছে ··· ···

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ হেসে বল্লেন, — আমি ত আস্তেই চালাচ্ছি, বিকেলের আগে আমাদের হাম্‌বুর্গ পেঁাছোতে হবে মনে আছে ?

কোল্‌ন্ শহর ছাড়িয়ে রাইন নদী ধ'রে কিছুক্ষণ চ'লে এরোপ্লেন নদী ছাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে চল্ল। আকাশ ঘোলা হয়ে আসতে লাগল, জোরে বাতাস বইতে লাগল। অজয় মুখ বাড়িয়ে দেখলে, নীচে গভীর বন, পাহাড়, তাও কুয়াসায়

অস্পষ্ট। সে চুপচাপ বসে রইল।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ বল্লেন, — আর একবার ওষুধ খাবে?

অজয় বল্লে, — না, আমি ঘুমোতে চাইনে। আমি বেশ ভালই বোধ করছি।

কিন্তু সে মোটেই ভাল বোধ করছিল না, তার মনে হতে লাগল চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। সত্যই তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছিল, ঘন কালো মেঘে আকাশ ভরা, আর নীচে পৃথিবী কুয়াসায় ঢাকা। সত্যই চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, না, সে চোখে অন্ধকার দেখছে, তা অজয় বুঝে উঠতে পারল না। মাথাটা ঘুরছে, সে চোখ বুজে ব'সে রইল। ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ এরোপ্লেনের গতি বাড়িয়ে দিলেন। এরোপ্লেন যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগল ততই বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল, তারপর বৃষ্টি এল, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সেই ঝড়জলের মধ্যে অজয় মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, খুব একটা দুঃসাহসিকতার কাজ করা যাচ্ছে আজ! এরোপ্লেনের এই ভ্রমণের বর্ণনাটা রং-চং ক'রে টোনির কাছে কি ভাবে গল্প করবে তাই সে ঠিক করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে কেমন ভয় হ'ল যদি এই ঝড়ে এরোপ্লেনটা ভেঙে পড়ে, যদি তারা কোন পাহাড়ের মাথায় বা নদীর জলে পড়ে যায়! চারিদিকের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে ডাক্তার ইয়েট্‌সের মুখের দিকে চাইলে। ডাক্তার ইয়েট্‌সের মুখ গম্ভীর, তিনি আর

কোন কথা কইছেন না, শুধু চালাবার যন্ত্রটা দৃঢ় ক'রে ধ'রে সম্মুখের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথ ঠিক ক'রে এরোপ্লেন চালিয়ে চলেছেন।

ঝড়জলের সঙ্গে যুঝে এরোপ্লেন এগিয়ে চল্ল ; ডাক্তার ইয়েট্সের মুখ গম্ভীর হতে গম্ভীরতর হচ্ছে, মাঝে মাঝে তিনি নীচের দিকে চাইছেন ; বন — শুধু বন, খোলা জমি একটুও নেই।

বৃষ্টি থামল, কিন্তু হাওয়ার বেগ ভয়ঙ্কর। ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া, অজয়ের শীত করতে লাগল, হাড়ের মধ্যে যেন কে স্থচ ফোটাচ্ছে। আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু বাতাসের কি প্রচণ্ড বেগ !

অজয়ের মাথা টলে উঠল ; তার শরীরটার যে কি অবস্থা, অর্থাৎ মাথা ঘুরছে, না গা বমি বমি করছে, না শীত করছে, না জ্বর আসছে, না বুক দুরদুর করছে, না নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে — সে বুঝে উঠতে পারছিল না তার কি হয়েছে, যেন অনুভব করবার স্নায়ুগুলি অসাড় হয়ে গেছে। শুধু তার মনে হচ্ছিল, এরোপ্লেন ভয়ঙ্কর দুলছে, ঝড়ে সমুদ্রে জাহাজ যেমন দোলে তেমনি দুলছে। হঠাৎ ডাক্তার ইয়েট্স্ চীৎকার ক'রে উঠলেন, অজয়ের বুক কেঁপে উঠল — যে মিস্ত্রিটা এরোপ্লেন সারিয়েছিল তার নামে কি গালাগাল দিয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ বিবর্ণ ! গ্যড গাড্। অজয়ের তবু ইচ্ছে হ'ল, সে চোখ কান বুজে থাকে, কিছু না দেখে, কিছু না শোনে, কিছু না অনুভব

করে। তীরাহত পাখী যেমন ডানার ঝাপটা দিয়ে আকাশে উড়ে যেতে, ভেসে থাকতে চায়, অথচ মাটির দিকে পড়ে, এরোপ্লেনটা তেমনই যতই শূন্যে এগিয়ে যেতে চাইছে ততই যেন নীচের দিকে মুখ করে পড়ছে, জোরে বাতাসের মুখে উড়ে যেতে ছট্‌ফট্‌ করছে, পারছে না।

ডাক্তার ইয়েট্‌স আর একবার চীৎকার ক'রে উঠলেন, একটা যন্ত্র প্রাণপণে টানছেন। অজয় কিছু বুঝতে পারল না, মনে হ'ল ইঞ্জিনটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে, তার হৃৎপিণ্ড বুঝি থেমে যায় ; সেও চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়াতে চেষ্টা করল, বুঝি এরোপ্লেন থেকে লাফ দিয়ে পড়তে চায়। সে দাঁড়াতে পারল না, চোখ বুজে মাথা টলে এরোপ্লেনের মেজেতে লুটিয়ে পড়ল। বিষাক্ত তীরবিদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করতে করতে এরোপ্লেনটি মুখ গুঁজে এক বনের পাশে খোলা মাঠে সশব্দে ভেঙে পড়ল। কালো আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, ঘন বন আন্দোলিত হ'ল, ঝ'ড়ো হাওয়া হা-হা শব্দে বয়ে গেল।

নয়

অজয় যখন চোখ চাইলে, দেখলে, সে ভিজে মাটির উপর পড়ে আছে, আর তার বুক হাত পা ঢেকে এরোপ্লেনের একটা ভাঙা অংশ চেপে রয়েছে। এরোপ্লেনটা যখন তীরবিদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট করতে করতে মাটির দিকে পড়তে আরম্ভ করল অজয় দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে দাঁড়াতে পারেনি, মাথা টলে এরোপ্লেনের মেজেতে লুটিয়ে পড়েছিল; তারপর তার যেন দম বন্ধ হয়ে এল, সে মূর্চ্ছিতভাবে পড়ে রইল। এরোপ্লেনটা যখন ভেঙে পড়ল, ভাগ্যক্রমে তার কোন আঘাত লাগল না, সে শুধু ছিটকে এরোপ্লেনের এক অংশে চাপা পড়ে রইল।

ভিজে মাটির স্পর্শে অজয়ের মূর্চ্ছাভাব কেটে গেল, সে শূন্য চোখে অন্ধকার আকাশের দিকে চাইল, সে যে কে, কোথায় আছে, তা যেন তার কিছু মনে পড়ছে না, সব ভুলে গেছে! কন্‌কনে ঠাণ্ডা মাটি! অজয় উঠতে চেষ্টা করলে, বড় দুর্ব্বল মনে হ'ল, আর এরোপ্লেনের ভাঙা অংশটা তাকে চেপে ধরেছে! এরোপ্লেনের সেই ভাঙা ডানার দিকে চাইতে বিদ্যুৎ চমকের মত অজয়ের সব কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, ডাক্তার ইয়েটসের সঙ্গে সে এরোপ্লেনে চড়ে যাচ্ছিল, তারপরে এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে! কিন্তু ডাক্তার ইয়েটস্ কোথায়? তিনি বেঁচে আছেন ত? কথাটা মনে হতেই অজয় আবার ওঠবার চেষ্টা করলে, তার দেহে

হঠাৎ অস্বাভাবিক শক্তি এল, সে এরোপ্লেনের ভাঙা অংশটা ঠেলে জোর ক'রে উঠে পড়ল, তার বাঁ হাত ও ডান পা একটু কেটে গেল, সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, লোহার ডানাটা প্রাণপণে সরিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল। দেখল, পেছনে গভীর বন ভরা ছোট পাহাড়ের সারি, সামনে দিগন্ত ভরা জনশূন্য প্রান্তর, একটি পাহাড়ের কোলে খোলা মাঠের উপর তাদের এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে, চারদিকে এরোপ্লেনের অংশ সব ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু ডাক্তার ইয়েট্‌স্ কোথায়? ডাক্তার ইয়েট্‌স্ কি ভাঙা এরোপ্লেনে চাপা পড়ে আছেন? অজয় কম্পিত স্বরে ডাকল,— ডাক্তার ইয়েট্‌স! ডাক্তার ইয়েট্‌স! কোন সাড়া নেই। বনপ্রান্তরে প্রতিধ্বনি হা-হা ক'রে উঠল,— ডাক্তার ইয়েট্‌স!

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ কি তা হ'লে মৃত? না, না, তা হতে পারে না। তিনি নিশ্চয় ভাঙা এরোপ্লেনে চাপা পড়ে আছেন। তাঁকে বাঁচাতে হবে। এরোপ্লেনের ভগ্ন স্তূপের মধ্যে অজয় ডাক্তার ইয়েট্‌সকে খুঁজতে আরম্ভ করল। কিন্তু ওই সব ভারী ভারী লোহার টুকরো সরিয়ে দেখবার শক্তি তার কোথায়! তারপর এই দুর্ঘটনাতে সে আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

ওই ত একটা পা দেখা যাচ্ছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, ভাল দেখা ত যাচ্ছে না। হাঁ, একটা পা-ই বটে! অজয় পা ধরে টানল। চেঁচিয়ে উঠল,— ডাক্তার ইয়েট্‌স! কোন সাড়া নেই। অজয়ের বুক কেঁপে উঠল। সে প্রাণপণ

বলে একটা ভাঙা অংশ সরিয়ে ফেল্লে, ধীরে ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌কে টেনে বার করলে, এরোপ্লেনের ভগ্নস্তূপ থেকে সরিয়ে তাঁকে খোলা মাঠে শুইয়ে রাখলে। ডাক্তার ইয়েট্‌সের কোন সাড়াশব্দ নেই, আর মাথার একধার রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। হায় ভগবান! ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ কি তাহ'লে মরে গেছেন! অজয় কিন্তু তা বিশ্বাস করতে চাইল না। সে ডাক্তার ইয়েট্‌সের জামা খুলে বুকের উপর কান রাখলে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কি একটুও পড়ছে না? তার মনে হ'ল দেহ এতক্ষণ একেবারে স্পন্দহীন ছিল, এখন বুকটা যেন একটু ফুলে উঠল, যেন ধীরে — অতি ধীরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। সে তাড়াতাড়ি তার রুমাল দিয়ে ডাক্তার ইয়েট্‌সের মাথাটা বাঁধলে; রক্ত জমাট হয়ে গেছে, সে দৃশ্য সে দেখতে পারছিল না।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌ নিশ্চয় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন, মাথা কেটে যাওয়ায় রক্ত অনেক পড়েছে, সে জন্যে দুর্ব্বল হয়ে গেছেন। এখন চোখেমুখে জল দিতে পারলে নিশ্চয় জ্ঞান হবে। অজয় এই ভেবে জলের সন্ধান করতে লাগল। এরোপ্লেনে যে জলের বোতল ছিল, সেটা নিশ্চয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আর না ভাঙলেও, সে বোতল এখন কোথায় খুঁজে পাবে! অদূরে একটা ছোট গর্ত্তে খানিকটা জল জমেছিল, অজয় তার শার্টের খানিকটা ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে আনলে, ডাক্তার ইয়েট্‌সের চোখেমুখে ভিজে নেকড়া বুলিয়ে করুণ সুরে ডাকল,— ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌!

অজয়ের চেষ্টা বৃথা হ'ল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ডাক্তার ইয়েট্‌স্ চোখ চাইলেন, অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন, — ও !

অজয়ের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, ডাক্তার ইয়েট্‌স্ তাহ'লে বেঁচে আছেন ! অজয় ধীর স্বরে বল্লে, — ডাক্তার ইয়েট্‌স্, আমাদের এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে, আমরা পাহাড়ের তলায় একটা জনশূন্য মাঠে।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ অজয়ের কথা শুনলেন ব'লে মনে হ'ল না, তিনি বেদনায় আর একবার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠে বল্লেন, — অজয়, জল ! জল।

বৃষ্টির দরুণ অদূরে একটা গর্ত্তে খানিকটা জল জমা ছিল, ডাক্তারকে সে জল দেওয়া ঠিক হবে না, কিন্তু ভাল জল সে কোথায় পায় ! অজয় অঞ্জলি ক'রে জল এনে ডাক্তার ইয়েট্‌সের মুখে দিলে। দু-তিন অঞ্জলি জল দেবার পর ডাক্তার ইয়েট্‌স্ অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন, একবার উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না, মাথা ঘুরে মাটিতে শুয়ে পড়লেন !

তখন তিনি জড়িত স্বরে বল্লেন, — অজয়, আমি এখানে শুয়ে থাকি, তুমি দেখ ত কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে কি-না।

অজয় বল্লে, — কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে ব'লে ত মনে হচ্ছে না ; আর তা ছাড়া আমি আপনাকে এখানে একা ফেলে যেতে পারব না। সামনের বনটা বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না,

কি সব বন্যজন্তু আছে বলা ত যায় না।

ডাক্তার মৃদু হেসে বল্লেন, – আরে পাগল ছেলে, এখন একটা গ্রামের খোঁজ না নিলে, এখানে কি সারারাত আমরা এ রকম পড়ে থাকব? এ তোমার ভারতীয় বন নয় যে, সিংহ হাতী গণ্ডার বাঘ — সব বের হয়ে আসবে।

অজয় গম্ভীর ভাবে বল্লে, — তা ছোট নেকড়ে বাঘও ত জঙ্গলে থাকতে পারে। না, আপনাকে আমি একা এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে কখনই যাব না।

ডাক্তার ইয়েট্‌স্ বল্লেন, — এদিকে ত সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আচ্ছা ধর দেখি আমার হাতটা, দেখি দাঁড়াতে পারি কি-না।

অজয়ের হাত ধ'রে ডাক্তার ইয়েট্‌স্ মনের জোরে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, দেহ তাঁর অতি দুর্ব্বল, পা টলে উঠল; দাঁড়াতে পারলেন না; মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অজয় দেখল, মাথায় বাঁধা রুমালটা আরও লাল হয়ে উঠেছে, রক্ত ঝরে পড়ছে, বস্তুত রক্তপাত বন্ধ হয়েছিল কিন্তু পড়ে গিয়ে আবার মাথায় আঘাত লেগে রক্ত পড়তে লাগল। অজয় তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা জল দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করতে চেষ্টা করল, রুমালটার উপর আর একখানা রুমাল জড়াল।

কিছুক্ষণ পরে রক্তপাত বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু ডাক্তার ইয়েট্‌স্ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুয়ে রইলেন, বুক ধুক্‌ধুক্ করছে, কিন্তু জ্ঞান নেই।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসতে লাগলো সামনের পাহাড় বন কালো, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। আর কিছুক্ষণ পরে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যাবে। আকাশ মেঘে ছাওয়া, একটি তারাও নেই। চারিদিক কোথাও জনমানব নেই, শহর গ্রাম কতদূরে তা কে জানে।

অজয় কিন্তু ভয় পেল না। সে ভাবল, এখন ভয় পেলে চলবে না। এ অবস্থায় যা কর্ত্তব্য তাই করতে হবে। সামনে খোলা মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত, জনহীন, উদাস, স্তব্ধ, সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ভরা। ওই মাঠের শেষে নিশ্চয় কোন গ্রাম বা পথ আছে। সেই দিকে যেতে হবে। কিন্তু ডাক্তার ইয়েট্স্‌কে সে ফেলে যেতে পারে না। ডাক্তার ইয়েটস্‌ তাকে ইংলণ্ডের এক শহরের পথ থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলে নিজের বাড়ীতে এনে শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়েছেন। কথাটা মনে হতেই অজয়ের দেহে যেন অমানুষিক শক্তি এল, সে ডাক্তারের সংজ্ঞাহীন দেহ নিজের পিঠের উপর তুলে নিল; তার দেহে কোথা থেকে এই ভার বহন করবার শক্তি এল তা ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। ডাক্তার ইয়েট্স্‌কে নিয়ে সে মাঠ পার হয়ে সামনে চল্ল, কোথায় পথ, কোথায় গ্রাম তার সন্ধানে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। পশ্চিমের আকাশে মেঘের কালো আবরণ সরিয়ে একটু সোনালী আলো ক্ষণিকের জন্য ছড়িয়ে পড়ল; অস্তগামী সূর্য্যের সেই আলোটুকু দেখে অজয়ের মনে

আশা ও শক্তি এল ; সে উৎসাহের সঙ্গে আরও জোরে এগিয়ে চল্ল !

বেশীক্ষণ সে চলেনি, বোধ হয় আধ ঘণ্টা হবে, তার মনে হ'তে লাগল যেন কত যুগ সে একটা গুরুভার বোঝা বহন করতে করতে চলেছে। যতই সে এগোচ্ছে ততই যেন বোঝাটা ভারী বোধ হচ্ছে। কিন্তু দমলে বা ভয় পেলে ত চলবে না।

সন্ধ্যার সিঁদুর আলো মিলিয়ে গেল, আকাশ কালো, দিগন্ত কালো, চারিদিক কালো হয়ে আসতে লাগল ; কোথাও একটু আলো দেখা গেল না ; কোন গ্রামের একটু আলোর জন্যে অজয় চারিদিকে তৃষিত চোখে তাকাতে লাগল, আকাশে একটিও তারা নেই, কোন দিকে একটু আলোর বিন্দু বা অগ্নি-রেখা নেই। আর সে বোঝা বইতে পারে না। শ্রান্ত দেহে ক্লান্তমনে অজয় ডাক্তার ইয়েট্সের সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে রেখে তাঁর পাশে হতাশভাবে বসে পড়ল। তার চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল, অদূরে বন বন্য জন্তুদের গর্জ্জনে ঠাণ্ডা বাতাসের সন্‌সনে আকুল হয়ে উঠল।

দশ

বেশীক্ষণ অজয়কে বসে থাকতে হয় নি, বোধ হয় আধ ঘণ্টা হবে, কিন্তু তার মনে হতে লাগল যেন কত রাত সে এই অন্ধকার নির্জ্জন প্রান্তরে ডাক্তার ইয়েট্‌সের সংজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে বসে আছে। কখনও তার মনে হ'ল রাত গভীর, বন্যজন্তুরা সব এখন পাহাড় থেকে নামবে, কখনও তার মনে হ'ল, বুঝি ভোর হয়ে এল, এখনি পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যের সোনার আলো দেখা যাবে।

একটা শব্দ শুনে সে চমকে উঠল, যেন একটা মোটরকার আসছে। আশাভরা চোখে সে চারিদিকে চাইল, শব্দটা কাছে আসছে, কিন্তু এ ঠিক এরোপ্লেনের শব্দ। অন্ধকার আকাশের এক কোণে একটু আলোর বিন্দু দেখা গেল। হ্যাঁ, এরোপ্লেনই বটে, তাদের মাথার ওপর দিয়েই যাচ্ছে, অনেক উঁচুতে রয়েছে। সে চেঁচাতে চাইল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না, আর চেঁচালেও এরোপ্লেনের লোকেরা যে শুনতে পাবে তার কোন আশা নেই। একটা বড় জোনাকি পোকার মত জ্বল্‌জ্বল্ করতে করতে এরোপ্লেনটা চ'লে গেল। আবার চারিদিক স্তব্ধ, চারিদিক অন্ধকার।

আরও মিনিট দশেক কেটে গেল। অজয়ের মনে হ'তে লাগল যেন কয়েক ঘণ্টা। আবার একটা শব্দ! আবারও একটা এরোপ্লেন না-কি? হায়, বিধাতা তাকে নিয়ে এমন পরিহাস করছেন কেন। শব্দটা কাছে আসছে, মোটরকারের

শব্দের মত মনে হচ্ছে। অজয় বিস্মিত চোখে দেখলে উত্তর দিগন্ত থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে, যতই এগিয়ে আসছে ততই চারিদিকের খোলা মাঠ আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে। হাঁ, মোটরকারই, একটা মোটরকারই বটে! অজয় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আলোটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, কি প্রখর দীপ্ত আলো! মোটরকারের হেড-লাইট না হয়ে যায় না। কিন্তু মোটরকারটাকে কি ক'রে থামানো যায়! মোটরকার যাবার পথটা কোথায়? হয়ত মোটরকারটা তাদের সামনে দিয়ে চলে যাবে যেমন এরোপ্লেনটা তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চ'লে গেল! না, মোটরকারটাকে থামাতেই হবে।

অজয় স্থির হয়ে দাঁড়াল, ডাক্তার ইয়েট্‌সের প্রতি নত হয়ে তাঁর মাথা থেকে একখানা রক্ত-ভেজা লাল রুমাল খুলে নিলে। তারপর, দানবের চোখের মত প্রদীপ্ত মোটরকারের আলোর দিকে মরিয়ার মত ছুটে গেল। মোটরকারটা তার দিকে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসছে; তার জ্বল্‌জ্বলে আলো অজয়কে কোন্ মায়ামন্ত্রে টানছে, লাল রুমাল উড়িয়ে অজয় মন্ত্রমুগ্ধের মত মোটরকারের দিকে ছুটল। সহসা তার চোখে ধাঁধা লাগল; তার মনে হ'ল বুঝি সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে, মোটরকার তাকে চাপা দিয়ে চ'লে যাবে। বনপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত ক'রে মোটরকারের হর্ণ বেজে উঠল; অজয় বুঝলে, মোটরকারের সোফার তাকে দেখতে পেয়েছে, এখন মোটরকারের আলোর

সামনে দাঁড়িয়ে তার পথরোধ ক'রে থাকতে হবে।

মোটরকারটা একেবারে অজয়ের সামনে এসে দাঁড়াল, আর একটু হ'লে তাকে চাপা দিত। অজয়ের চোখ হেড-লাইটের তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেল, সে শুধু প্রাণপণে বিপদজ্ঞাপক লাল রুমাল নাড়াতে লাগল। মোটরকারের সোফার যখন তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে জার্ম্মানভাষায় বল্লে, — কে হে ছোকরা তুমি! কি ব্যাপার! অজয় তখন যেন সচেতন হয়ে উঠল। জার্ম্মানভাষা শুনে অজয়ের আনন্দের সীমা রইল না। সোফার যদি ডাচ্ বা রাশিয়ান বা ফ্রেঞ্চ ভাষা বলতে আরম্ভ করত, সে মুস্কিলে পড়ত। হেড-লাইট থেকে সরে দাঁড়িয়ে অজয় দীপ্তস্বরে বল্লে,— আমরা, আমরা এরোপ্লেন ভেঙ্গে এখানে পড়েছি, আমাদের এরোপ্লেন চুরমার হয়ে গেছে, ডাক্তার ইয়েট্‌স্ অজ্ঞান—

এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়েছি, – কথাটা শুনে সোফার চমকে উঠল। মোটরকারের দরজা খুলে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বার হয়ে এলেন। তাঁর মাথাজোড়া টাক, মুখখানি তেজোময়। তিনি অজয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, — কোথায়, এরোপ্লেন কোথায়? আর সব যাত্রীরা?

অজয় বল্লে, — ডাক্তার ইয়েট্‌স্ আর আমি আজই সকালে ইংলণ্ড থেকে থেকে রওনা হয়েছিলুম, আমরা হামবুর্গ যাচ্ছিলুম, পথে ঝড়ে এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়ে, ডাক্তার ইয়েট্‌স্ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্লেন, — কোথায়, কোথায় তিনি? সোফারের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি হুকুম দিলেন, — রিচার্ড তাঁকে এখানে তুলে আন, তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে দেখছি।

সোফারকে নিয়ে অজয় ডাক্তার ইয়েট্‌স্ যেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন সেদিকে যাবে এমন সময় সে অবাক হয়ে দেখলে মোটরকার থেকে একটি সুন্দরী তরুণী নামলেন, তাঁর একহাতে ওভারকোট ও টুপি; তিনি প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির কাছে এসে বল্লেন, — বাবা তোমার ওভারকোট পর শীগগীর, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কি হয়েছে বাবা?

মেয়েটির কণ্ঠস্বর অজয়ের ভারি ভাল লাগল, মুখখানি বড় মিষ্টি, হেলিয়ট্রোপ রঙের ফ্রকটিতে মেয়েটিকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। অজয় ব'লে উঠল, — আমরা এরোপ্লেন ভেঙ্গে এখানে পড়েছি।

মেয়েটি সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠলেন, — সত্যি! আহা, তোমাদের বড় কষ্ট হয়েছে? কোথায় এরোপ্লেন? তুমি — তুমি কি ইতালীয়ন?

অজয় হেসে বল্লে, — না আমি ভারতীয়, আমার বাড়ী কলকাতায়। আগে ডাক্তার ইয়েট্‌সকে নিয়ে আসি, তারপর আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব।

সোফার রিচার্ড অজয়কে নিয়ে ডাক্তার ইয়েট্‌সের দিকে ছুটল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির নাম হেয়ার শিলার, তিনি একজন কোটিপতি, তাঁর এক এরোপ্লেন তৈরি করবার বড় কারখানা আছে, তাছাড়া তিনি জহুরী, হীরে মণিমাণিক্য নিয়ে কারবার করেন। তাঁর মেয়ে ক্লারা তাঁর অতি প্রিয়, তাই যেখানে যান, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান। হল্যাণ্ডে একটা কাজ সেরে তিনি জার্ম্মানীতে ফ্রাঙ্কফোর্টে আসছিলেন, পথে অজয় তাঁর মোটর দাঁড় করিয়েছে।

অজয়ের সাহায্যে রিচার্ড যখন ডাক্তার ইয়েট্‌সকে মোটরের কাছে নিয়ে এল তখন ডাক্তার ইয়েট্‌সের জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু বড় তুর্ব্বল। মোটরকারে কিছু খাবার ও মদ ছিল। ক্লারা তাড়াতাড়ি ব্র্যাণ্ডির বোতল বার ক'রে একটি ছোট গেলাসে ব্র্যাণ্ডি ভরে ডাক্তার ইয়েট্‌সকে খাইয়ে দিলেন। ব্র্যাণ্ডি খেয়ে ডাক্তার ইয়েট্‌স একটু তাজা হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না, শুধু বল্লেন,— ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।

হেয়র্ শিলার বল্লেন,— আর দাঁড়িয়ে কোন লাভ নেই, এরোপ্লেনের ব্যবস্থা কাল যা হয় করা যাবে, এখন এঁদের নিয়ে শীগগীর ফ্রাঙ্কফোর্টে যাওয়া যাক।

হেয়র্ শিলারের হিসপানো সুইত্‌সা সেডান মোটরকারটি যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই বৃহৎ ও আরামজনক। ডাক্তার ইয়েট্‌স্‌কে একদিকে অর্দ্ধশায়িত ক'রে রাখা হ'ল। অজয় বল্লে

যে সে সোফারের পাশে বসে যাবে। কিন্তু তরুণী ক্লারা তা কিছুতেই দিলেন না। তিনি অজয়কে তাঁর কাছে টেনে নিলেন, যেন তাঁর ছোট ভাইটি।

রিচার্ড আবার প্রচণ্ডবেগে মোটর হাঁকিয়ে চল্ল। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রাঙ্কফোর্টে পৌঁছে যাবে।

তারপর দু'দিন কেটে গেছে। ডাক্তার ইয়েট্‌স্ হাস্পাতালে বেশ সেরে উঠছেন। অজয় প্রথমে তাঁর সঙ্গে হাস্পাতালে থেকে তাঁর শুশ্রূষা করতে চেয়েছিল ; কিন্তু হাস্পাতালে রোগী ভিন্ন কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না, আর ক্লারা অজয়কে অন্য কোথাও থাকতে দিলেন না, তাঁদের হোটেলে নিয়ে গেলেন। সে কি প্রকাণ্ড সুন্দর হোটেল! এমন সাজানো আরামজনক ঘর, এমন খাবার, এমন জাঁকজমক সে জীবনে দেখেনি। ক্লারার সঙ্গে অজয়ের খুব ভাব হয়ে গেছে ; তিনি এখন তার দিদি। ক্লারা-দিদির সঙ্গে সে পরম আনন্দে ফ্রাঙ্কফোর্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত জিনিষ দেখে অবাক হচ্ছে — মিউজিয়াম, চিত্রশালা, চার্চ্চ, কত কি আশ্চর্য্যকর জিনিষ। সেদিন সন্ধ্যায় পামেনগার্টেন ব'লে একটি বড় বাগানে বসে তার বড় ভাল লাগছিল। ক্লারা-দিদি ও সে গাছের তলায় বসে কেক ও কফি খাচ্ছে, অদূরে কনসার্ট হচ্ছে, বাজনা বাজছে, চারিদিকে ছেলে-মেয়েরা হেসেখেলে বেড়াচ্ছে। টোনির কথা, লীনার কথা তার

বড় মনে পড়তে লাগল। সে ধীরে বল্লে, – ক্লারা-দি, কাল সত্যি আমরা বার্লিন যাচ্ছি ? টোনিরা নিশ্চয় এতদিনে হাম্‌বুর্গে এসে পৌঁচেছে।

ক্লারা বল্লেন,—বাবার যে বার্লিনে বড় দরকারী কাজ রয়েছে, তা না হ'লে আমরা কালই হাম্‌বুর্গে যেতে পারতুম, আর বাবাকে জান ত, আমাকে একা কিছুতেই ছাড়বেন না।

অজয় হেসে ঠাট্টার সুরে বল্লে, – তা তিনি ছাড়বেন কেন, তুমি ত এখনও ছোট খুকি, যদিও আমার দিদি, আর আমি দেখ দিকিন, ভারতবর্ষ থেকে একা কতদূর চ'লে এলুম —

ক্লারা একটু রেগে ব'লে উঠলেন, – বেশী বক্‌বক্ করিস্ নে, বাজনাটা শুনতে দে।

— আচ্ছা ক্লারা-দি, আমি একটু এদিকে বেড়িয়ে আসছি। ব'লে অজয় খাবারের ছোট টেবিল ছেড়ে সামনের মাঠে বেড়াতে গেল।

একটি ঝোপের পেছনে দুটি লোক ব'সে। দু'জনকেই বেশ ষণ্ডা দেখতে, গুণ্ডা গোছের চেহারা। অজয় একটু ভাল ক'রে তাদের দিকে চাইল ; তাদের যেন চেনা-চেনা মনে হ'ল। হাঁ, তাদের সে হোটেলে দেখেছে। লোক দু'টি অজয়কে দেখতে পায়নি, তারা কি কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত। হঠাৎ হেয়র্ শিলারের নাম কানে আসতে অজয় স্থির হয়ে একটু লুকিয়ে দাঁড়াল। লোক দু'টি কি একটা পরামর্শ ভাঁজছে।

বেঁটে টেকো লোকটা বল্লে, — তুই ঠিক জানিস শিলার আজ জিনিষটা নিয়ে আসবে ?

ঢেঙা লোকটা তার কৃত্রিম দাঁতগুলো বার ক'রে বল্লে,— হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি, ব্যাঙ্কের সে কেরানীটার কাছে জেনেছি — একশ' মার্ক দিতে হ'ল — কাল সকালেই ওরা বার্লিন যাচ্ছে।

বেঁটে লোকটা তার টাক মাথাটা নেড়ে বল্লে, — তাই ত শুনছি — তাহ'লে আজকে রাতেই —

ঢেঙা লোকটা তার হাতের লাঠি ঠুকে বল্লে, — আমি তাই বলছি — ঠিক ক'রে ফেল্।

লম্বা লোকটা লাঠি ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। অজয়ের ভয় হ'ল, বুঝি তাকে এরা দেখে ফেলে ; সে নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে সরে দূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল। হেয়র শিলারের বিরুদ্ধে এরা কি চক্রান্ত করছে ? — কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, কি ব্যাপার। শিলারের আজ আবার কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, আসবেন বোধ হয় গভীর রাতে। আর ক্লারা-দি'কে বল্লে, দিদি নিশ্চয় তাকে পরিহাস করবেন। সে তাড়াতাড়ি ক্লারা-দিদির কাছে চ'লে গেল।

রাত তখন প্রায় বারোটা। হোটেল নিঝুম, রাস্তায় মাঝে মাঝে দু-একখানা মোটরকার সশব্দে চ'লে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে অজয়ের কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিল না; পার্মেনগার্টেনেতে বেঁটে টেকো লোকটার সঙ্গে ঢেঙা লোকটির যে কথাবার্ত্তা সে শুনেছিল, তাই তার মনে পড়তে লাগল। বেঁটে লোকটা যে তার টাক মাথা নেড়ে বলেছিল,—তাহ'লে আজকে রাতেই! আজকে রাতে হেয়র্ শিলারের বিরুদ্ধে তাদের কিছু দুরভিসন্ধি আছে হয় ত, তা না হ'লে তার নাম কেন কর্‌ছিল!

ডিনার খাওয়ার পর ক্লারা-দিদি তাকে অনেকক্ষণ পিয়ানো বাজিয়ে শুনিয়েছেন। পিয়ানোর একটা টুং-টাং সুর তার কানে বাজতে লাগল; কিন্তু সেই ঢেঙা লোকটার কৃত্রিম দাঁতের রহস্যময় হাসি আর লাঠি ঠোকার শব্দ মাঝে মাঝে পিয়ানোর সুরের মধ্যে বেজে তালভঙ্গ ক'রে দিল। অজয় একবার ভাবল ক্লারা-দিদির কাছে গিয়ে তাকে সব কথা বলে। কিন্তু তিনি এখন নিশ্চয় গভীর নিদ্রিত। হেয়র শিলার এখনও নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরেননি। অজয়ের ঘর হেয়ার শিলারের ঘর ও ক্লারা-দিদির ঘরের মাঝে, হেয়ার শিলার ঘরে এলে সে শুনতে পেত, কারণ মাঝের দেওয়াল খুব পাৎলা, ফাঁপা ইট দিয়ে গড়া, পাশের ঘরে শব্দ হ'লেই শোনা যায়।

হেয়র্ শিলার হোটেলে ফিরে এলেই তাঁকে এই চক্রান্তের কথা বলা দরকার। অজয় ধীরে বিছানা থেকে উঠল; তার পরনে রাতে শোবার পাজামা ও কোট; সে-সাজ পরে ঘরের বাইরে বা নীচে ড্রয়িং-রুমে যাওয়া ভয়ানক অভদ্রতা, ক্লারা-দিদি তাকে ব'লে দিয়েছেন। সুতরাং হেয়র শিলারের ঘরে গিয়ে প্রতীক্ষা করতে হবে, কিন্তু তাঁর ঘর এখন বন্ধ। অজয়ের ঘরের আলো নেবান, জানলা দিয়ে পথের আলো আসাতে ঘর আলো-অন্ধকারে ভরা। অজয় ধীরে জানলার পর্দ্দাটা টেনে সরিয়ে দিলে, তার ব্রাউন রঙের ড্রেসিং গাউনটা পরল, তারপর কাঁচের দরজা খুলে বাইরে গাড়ী-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সরু গাড়ী-বারান্দাটি হেয়র শিলারের ঘর, অজয়ের ঘর ও ক্লারা-দিদির ঘর, এই তিনখানি ঘর জুড়ে; প্রতি ঘরের রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে গাড়ী-বারান্দায় যাওয়া যায়; দরজাটির উপর-অংশ হচ্ছে একখানা বড় মোটা কাঁচ ও তলার অংশ কাঠ; কাঁচের অংশে একটি সুন্দর লেসের সাদা পর্দ্দা ঝুলছে।

গাড়ী-বারান্দা থেকে অজয় শিলারের ঘরের দিকে চাইলে। ঘরের জানালা খোলা! জানলা খোলা দেখে তার মনে কেমন ভয় হ'ল। জানলা খোলা দেখে ভয় হবার কোন কারণ নেই, তবু তার কেমন ভয় হ'ল। হেয়র শিলারের ঘরের জানলা সব সময় বন্ধ থাকে, এখন খোলা কেন? ঘর অন্ধকার। সে একবার ঘরের দিকে চাইল, তারপর পথের দিকে চেয়ে রইল,

কখন হেয়র শিলারের গাড়ী আসে।

মোড়ের থিয়েটার যখন ভাঙল, জনবিরল পথ আবার জনস্রোতে ভরে হাস্যে পদশব্দে মুখর হয়ে উঠল ; অজয় মুগ্ধ-নেত্রে সেই লোকজনের আনা-গোনার দিকে চেয়ে রইল, রাতের শহরের আলোছায়া-ভরা পথে অজানা নরনারীদের যাওয়া-আসা দেখতে দেখতে সব ভুলে গেল ; পথের রহস্যময় আলোয় এই কালো-মূর্ত্তিদের স্রোত দেখার কোন্ যাদু আছে।

সহসা সে চমকে উঠল, তার পাশে কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে ; মুখ ফিরিয়ে দেখলে হেয়র শিলারের ঘর আলোয় ভরা ; হেয়র শিলারের মোটরকার কখন হোটেলের দরজার সামনে এসেছে, কখন তিনি ঘরে এসে আলো জ্বালিয়েছেন, গাড়ী-বারান্দার কাঁচের দরজা খুলেছেন, তা সে টের পায়নি।

অজয় খোলা দরজার দিকে এগিয়ে এল, ঘরের তীব্র আলো দরজা দিয়ে আসছে, অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোর দিকে চাইতে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল, সে দরজার পাশে ছায়াতে এসে দাঁড়াল। হেয়ার শিলার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন, পাশে ড্রেসিং-রুমে সাজ বদলে আসতে গেলেন।

অজয় খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবে কি-না ভাবছে, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা খস্‌খস্ শব্দে সে চমকে উঠে চেয়ে দেখলো পামেনগার্টেনের সেই দুটো লোক ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তারা কোথায় লুকিয়েছিল ? তারা যেন ঘরের মেজে ফুঁড়ে

হঠাৎ দুঃস্বপ্নের মত আবির্ভূত হ'ল। হেয়র শিলারের কাঠের সুন্দর খাটখানার ঠিক পাশে লিনোলিয়ামের মেজের ওপর একটি ছোট পারস্যদেশীয় কার্পেট পাতা; টেকো লোকটা কার্পেটের একদিকে একটি রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আর ঢেঙা লোকটি কার্পেটের মাঝে একটা বড় রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে তারা হেয়র শিলারের আসার প্রতীক্ষা করছে। লোক দুটিকে হঠাৎ এরকম ভাবে দেখে অজয় যেন হতভম্ব হয়ে গেল. দরজার অন্ধকার আড়ালে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'ল, যদি সে দরজা দিয়ে ঢোকে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ এই বেঁটে টেকো লোকটির হাতের রিভলভার তার বুকের উপর এসে পড়বে।

সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে! এ রকম দৃশ্য অজয় কখনও দেখেনি। হেয়র শিলার ঘরের মাঝে লিনোলিয়ামের সবুজ রঙের মেজেতে দাঁড়িয়ে, আর তাঁর সামনে কার্পেটের উপর সেই দু'টো লোক দাঁড়িয়ে, বেঁটে লোকটা তার রিভলভার হেয়ার শিলারের বুকের ওপর ধরেছে, হেয়ার শিলার তাঁর দু-হাত মাথার ওপর সোজা করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ থেকে যেন সব রক্ত চলে গেছে, পা কাঁপছে, আর ঢেঙা লোকটা তার রুমাল ভাল ক'রে ধরে পকেট থেকে একটা শিশি বার ক'রে শিশির ছিপি খুলছে! কি করতে চায় ওরা! ওরা কি হেয়ার শিলারকে খুন করতে চায়? অজয় ভাবলে, যদি সে

চীৎকার ক'রে কাউকে ডাকে তবে হয়ত ওরা হেয়ার শিলারকে গুলি ক'রে মেরে পালাবে। কি করা যায় ?

কিন্তু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না! ঢেঙা লোকটা শিশি খুলে কি ঢালছে রুমালে! বাঁচাতে হবে, হেয়র্ শিলারকে বাঁচাতে হবে।

মৎলবটা তার মাথায় কি ক'রে এল তা ভেবে পরে সে অবাক হয়েছে। পরে সে সবাইকে বলেছে, সে নিজে ভেবে করেনি, ঈশ্বর তাকে দিয়ে এ কাজ করিয়েছেন, হেয়র শিলারকে বাঁচাতে।

অজয় একটু নত হয়ে বারান্দার খোলা দরজা দিয়ে তীরের মত ঘরে গিয়ে ঢুকল, তারপর কার্পেটের দুই কোণ দুই হাত ধ'রে প্রাণপণ জোরে টান দিল ; এত জোরে জীবনে সে কোন জিনিষ টানে নি। কার্পেটের শেষের দিকে দাঁড়িয়েছিল বেঁটে লোকটা আর মাঝে দাঁড়িয়েছিল লম্বা লোকটা রুমাল হাতে করে। হঠাৎ অতর্কিতে জোরে কার্পেট টান্‌তে দুজনেই পা পিছলে মেজেতে পড়ে গেল, লম্বা লোকটা বেঁটে লোকটাকে চেপে পড়ল ; পড়বার সময় হাত কাঁপাতে বেঁটে লোকটা তার রিভলভার টিপে দিয়েছিল, রিভলভারের গুলি সামনের বড় আয়নার কাঁচে লেগে ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়ল, রিভলভারটা কোথায় ছিটকে পড়ল ; বেঁটে লোকটির টাক ফেটে লাল রক্তে সবুজ মেজে রঙীন হয়ে

উঠল। লোক দুটো আবার যাতে না উঠতে পারে অজয় তার ব্যবস্থাও ভেবেছিল। খাটের পাশে লেখবার একটি ছোট টেবিল ছিল, সেটি জোরে ধ'রে সে লোক দুটির ওপর উল্টে ফেল্লে, লোক দুটিকে টেবিল চাপা দিয়ে তারপর একটি ভারি কম্বল চাপা দিয়ে তার ওপর সে চেপে বসে চেঁচাল, — হেয়র শিলার, শীগগীর, শীগগীর পালান এখান থেকে।

টেকো লোকটা তখন গোঁ গোঁ করছে আর লম্বা লোকটা উঠতে চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু টেবিল কম্বল ও অজয়ের ভার ঠেলে তার দুর্ব্বল বাঁ পা নিয়ে ওঠা অসম্ভব। সে টেকো লোকটাকে গালি দিতে সুরু করল।

শিলার হতভম্ব হয়ে গেছলেন। অজয়ের দুঃসাহসিক কাণ্ডটা লিখতে এতগুলি লাইন লাগল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছিল এক মিনিটের মধ্যে। শিলারের চোখের সামনে যেন ভেল্কিবাজী হয়ে গেল। অজয় চেঁচিয়ে উঠল,— হেয়র শিলার, পালান এখান থেকে !

অজয়ের কণ্ঠস্বরে শিলার সচেতন হলেন, তিনি চাকরদের ডাকবার ঘণ্টা টিপে টেকোর রিভলভারটা মেজে থেকে তুলে নিলেন।

ঘণ্টা টেপবার কোন দরকার ছিল না ; রিভলভার ছোঁড়া ও আয়না ভাঙার শব্দে সমস্ত হোটেল জেগে উঠেছিল। চাকরেরা শিলারের ঘরে ছুটে এল। তারপর এক হৈ-চৈ

কাণ্ড। ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার, সব ছুটে এলেন, হোটেলের অন্য সব লোকেরা বারান্দায় ভিড় করলেন। তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করাতে, পুলিশ এল; তার সঙ্গে এল সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা, ফটোগ্রাফারেরা! হেয়র শিলারের ঘরে ভুমুল কাণ্ড বেধে গেল।

ক্লারা এসে তার বাবাকে ও অজয়কে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেল্লেন; অজয়কে বার বার বুকে জড়িয়ে আদর ক'রে বল্লেন, — বীর ভাই আমার, বীর ভাই! সবাই অজয়ের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে প্রশংসা করলে, — বীর বালক।

পুলিশ এসে লোক ছু'টিকে বন্দী করলে, বল্লে, তারা দাগী চোর, তাদের অনেক দিন ধ'রে খুঁজছে। টেকো লোকটা কেঁদে ফেল্লে আর ঢেঙা লোকটা টেকোকে খালি গালাগালি দিতে লাগল।

ফটোগ্রাফারেরা অজয়কে এসে ধরল তার ছবি তুলতে হবে। অজয় কিছুতেই তুলতে দিতে চায় না, যদিও মনে মনে ইচ্ছা তার ফটো সবাই নেয়। দেখালে, যেন ক্লারা-দিদির অনুরোধে সে রাজী হ'ল। ফ্লাস লাইটে অজয়ের তিন চারখানি ছবি নেওয়া হ'ল।

ক্লারা বল্লেন, — বাবা, তোমার ওই হীরাগুলি হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জমা রেখে দাও, তা না হ'লে আমার রাতে ঘুম হবে না।

বস্তুত ওই হীরাগুলির জন্যেই এত ব্যাপার। হেয়র শিলার বড় জহুরী, ফ্রাঙ্কফোর্টের এক ব্যাঙ্কে তার কতকগুলি হীরা গচ্ছিত ছিল, দু'লাখ টাকার ওপর দাম হবে। সে দিন ব্যাঙ্ক থেকে হীরাগুলি এনে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগে সেগুলি রেখে শার্টের সঙ্গে ব্যাগটি সেলাই ক'রে নিজের সঙ্গে সঙ্গে সব সময় হীরাগুলি রেখেছিলেন। যখন শুতে আসছিলেন, সেই হীরেভরা ব্যাগওয়ালা শার্ট তাঁর গায়ে ছিল, তার ওপর ছিল বিছানাতে পরার কোট। শিলারকে অজ্ঞান ক'রে সেই হীরেগুলি নেবার জন্যেই টেকো ও লম্বা লোক দু'টি ষড়যন্ত্র করেছিল।

ক্লারার অনুরোধে হীরাগুলি হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গচ্ছিত রাখতে হ'ল, কিন্তু সে রাতে আর তাঁর ঘুম হ'ল না।

পরদিন সকালেই তিনি ক্লারা ও অজয়কে নিয়ে হীরের ব্যাগ আবার শার্টের সঙ্গে সেলাই ক'রে বর্লিনের দিকে মোটর হাঁকিয়ে চল্লেন। ফ্রাঙ্কফোর্টে থাকলে সংবাদপত্রের সংবাদদাতারা তাঁকে জ্বালাতন ক'রে মারবে।

বার্লিন শহরে এসে অজয়রা এক প্রকাণ্ড হোটেলে উঠল। একটা হোটেল যে এত বড় হতে পারে তা তার ধারণা ছিল না, এ যেন একটা ছোট শহর। হোটেলটি সাত তালা, তার দুটি তালা মাটির নীচে। সে দু-তালা জুড়ে রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ঝি-চাকরদের থাকবার ঘর। হোটেলটির সঙ্গে নাপিতের দোকান, ফুলের দোকান, খবরের কাগজের দোকান, জামাকাপড়ের

দোকান, সব রকম দোকান আছে ; কিছু দরকার হ'লে ঘরে ব'সে ঘণ্টা টিপলেই হ'ল, তখুনি বেহারা ছুটে আসবে, যা দরকার তা কিনে নিয়ে আসবে ; অথবা ঘরে বসে টেলিফোন করলেও চলে, যে-কোন দোকানে টেলিফোন ক'রে জিনিষ আনান যায়।

সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে হেয়র্ শিলার কোথায় কাজে বার হয়েছেন, ক্লারা-দিদির শরীর তেমন ভাল নয়, তিনি তাই অজয়কে হোটেলের সহকারী ম্যানেজারের জিম্মায় দিয়ে হোটেলটা দেখাতে বলেছেন। অজয়ের মন কিন্তু শহরটা দেখবার জন্যে উস্‌খুস্ করছে। হোটেল ঘোরা শেষ হ'লে অজয় ম্যানে-জারের অলক্ষ্যে বার্লিনের রাস্তায় বার হ'য়ে পড়ল।

বার্লিন শহর দেখে সে অবাক হয়ে গেল ; রাস্তাগুলি সোজা চলে গেছে, কি পরিস্কার, কি সুন্দর ! ফুটপাথ, রাস্তা সব তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করছে, লোকের থাকবার ঘরও এত পরিষ্কার থাকে না ; কোথাও একটু ময়লা, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও নেই। আশ্চর্য্য হয়ে বার্লিনের রাস্তা দেখতে দেখতে অজয় চল্ল, কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা তার খেয়ালই রইল না। দেখলে, প্রতি রাস্তার মোড়ে টেলিগ্রাফ-পোষ্টের সঙ্গে ছোট একটি তারের চুপড়ী টাঙান ; ট্রামের বাসের টিকিট, বাজে কাগজ সব লোকে চুপড়ীতে ফেলছে, রাস্তায় ফেলে কেউ রাস্তা অপরিষ্কার করে না। প্রতি চৌমাথায় শুধু যে দু'দিকের রাস্তার নাম বড় হরফে লেখা আছে তা নয়, এক-এক

দিকের রাস্তায় সেই মোড় হতে পরের মোড় পর্য্যন্ত কত নম্বরের বাড়ীগুলি আছে তাও লেখা আছে। দু'ধারে বাড়ীগুলি ছবির মত সাজান, তাদের জানলায় রঙীন ফুলের টবগুলি অজয়ের বড় ভাল লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে সে এক বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। তার সামনের রাস্তা কি প্রকাণ্ড চওড়া, সোজা চলে গেছে মাইলের পর মাইল। প্রথমে চওড়া ফুটপাথ, তারপর মোটর গাড়ী যাবার রাস্তা, তারপর ট্রাম লাইন, তারপর দু'সারি গাছের মাঝে বেড়াবার ও ঘোড়ায় চড়বার লম্বা পথ; গাছের তলায় বসবার বেঞ্চি পাতা; এই সুন্দর বীথিকার পর আবার ট্রাম লাইন, গাড়ী যাবার রাস্তা ও চওড়া ফুটপাথ। অজয় ফুটপাথ ছেড়ে এই গাছের সারির ছায়াস্নিগ্ধ পথ দিয়ে চল্ল। তার দু'ধারে মোটর গাড়ীর স্রোত বয়ে চলেছে। আর মাঝে গাছের তলায় ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। সকালের আলোয় বার্লিন শহরের পথের নানা দৃশ্য তার চোখে বড় ভাল লাগল।

চলতে চলতে সে দু'মাইলের উপর চ'লে এসেছে, শহর থেকে শহরতলীতে এসে পৌঁচেছে, পাড়াটা নির্জ্জন মনে হচ্ছে। সহসা সে এক গোলমালে চমকে উঠল। ডানদিকের চওড়া গলিতে কি হৈ-চৈ হচ্ছে। লোকজন চারদিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। ইয়োরোপের শহরের রাস্তায় লোকেরা এত জোরে চলে যে মনে হয় তারা ছুটছে, যেন সব সময়েই তাদের

সময়ের অকুলান ; কিন্তু এ রাস্তায় নরনারীদের অতি দ্রুত গতি অজয়ের কাছে কিছু অস্বাভাবিক মনে হ'ল, সবাই গলির দিকে ছুটছে কেন ?

অজয়ও গলির ভিতর চল্ল। সেখানে দেখল, খুব ভিড় জমে গেছে, পুলিশ সার বেঁধে ভিড় ঠেলছে, ব্যাপার ভয়ঙ্কর ! সামনের বড় বাড়ীতে আগুন লেগেছে ! তার উপর তালা থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে, ওপরেই আগুন লেগেছে। ফায়ার ব্রিগেড্ এসেছে, তাদের লম্বা সিঁড়ি লাগাচ্ছে। কি লম্বা লোহার সিঁড়ি ! সিঁড়িটা একেবারে বাড়ীর ছাদে গিয়ে ঠেকল।

ভয়ঙ্কর ভিড় ! পুলিশ খালি লোকদের পেছনে হটিয়ে দিচ্ছে, বাড়ীর সামনে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। অজয় ভিড় ঠেলে এক্কেবারে সামনে পুলিশের সারির কাছাকাছি এসে পড়ল, দেখলে, নীচের তালা থেকেও ধোঁয়া বার হচ্ছে, আগুনের লক্‌লক্ শিখা নীচের তালার জানলাগুলির ভিতর দিয়ে আসছে, আগুনের তাপ তাদের দেহের উপর এসে লাগছে, গরম বাতাস খ্যাপা ঘোড়ার মত এলোমেলো বইছে।

সমস্ত বাড়ীতে আগুন লেগেছে। বাড়ীর সব লোকেরা বার হয়ে এসেছে ত ? অজয় একটা পুলিশকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বল্লে,— বাড়ীর ভেতর লোক আছে ? পুলিশটা কোন উত্তর না দিয়ে তাকে পেছনে আরও ঠেলে দিলে। অজয় বেশী হটল না, দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ীতে যদি কোন নিদ্রিত

ছেলেমেয়ে থাকে ? কি ভয়ঙ্কর ! বাড়ীটা সে চঞ্চল দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। সহসা তার মনে হ'ল, তেতালার ঘরের এক ছোট জানলায় লাল জিরেনিয়াম ফুলের লম্বা কাঠের টবের আড়ালে একটি খুকীর ছোট মুখ দেখা যাচ্ছে, খুকীটি অবাক হয়ে রাস্তার ভিড় দেখছে, বাড়ীতে যে আগুন লেগেছে তা সে নিশ্চয় জানে না, কারণ তার মুখে হাসি। অজয় স্থির দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকাল, হাঁ, সত্যি ! একটি খুকী দাঁড়িয়ে, লীনার মত দেখতে। অজয় চমকে লাফিয়ে উঠল, — ও লীনা ! লীনা ! প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, — লীনা ! সে পুলিশকে ঠেলে ফায়ার ব্রিগেডের সিঁড়ির সামনে ছুটে গিয়ে প্রাণপণে চেঁচিয়ে বল্লে, — তেতালার ঘরে একটি ছোট মেয়ে রয়েছে, শীগগীর তাকে বাইরে নিয়ে এস।

ফায়ার ব্রিগেডের দলের কর্ত্তা একটু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লে, — কৈ ?

অজয় আবার সেই জানলার দিকে চেয়ে দেখলে কেউ নেই। তা'হলে সে কি ভুল দেখেছে ? একটা পুলিশ তার হাত জোর ক'রে ধ'রে তাকে আবার ভিড়ের ভিতর ঠেলে বল্লে, — দ্যাখ ছোকরা, আবার যদি তুমি আমাদের লাইন ভেঙে আস ত তোমাকে ধ'রে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

পিছনে দাঁড়িয়ে অজয় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তার ভুল হয়নি। লীনাকে সে জানলায় দেখেছে ; লীনা এখন ঘরের

মধ্যে গেছে, সে নিশ্চয় একা, সে জানে না বাড়ীতে আগুন লেগেছে। টোনি কোথায়? তার বোনকে এমন ক'রে একা ফেলে গেছে কেন?

ওই, ওই আবার লীনার মুখ জানলার পাশে টবের আড়ালে দেখা গেল। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা কিন্তু লীনাকে দেখতে পাচ্ছে না; বোধ হয় পাবেও না; ওরা এখন চার তালায় সিঁড়ি লাগিয়েছে। লীনা হয়ত আগুনে পুড়ে মরবে! না, বাঁচাতে হবে, লীনাকে বাঁচাতে হবে। ফায়ার ব্রিগেডের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে প্রথমে পুলিশ বাধা দেবে, তারপর ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরাও তাকে পাগল ব'লে ধ'রে নামিয়ে দেবে, খুকীকে সে ত ফায়ার ব্রিগেডের দলের কর্ত্তাকে দেখাতে পারে নি।

কিন্তু লীনাকে বাঁচাতে হবে। বাড়ীর দরজা খোলা, তার সামনে লোক কেউ নেই। পুলিশ কাউকে যেতে দিচ্ছে না সেদিকে। দরজার পাশের জানলা দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু দরজা দিয়ে শুধু একটু একটু ধোঁয়া আসছে। দরজার পাশেই সিঁড়ি হবে। সিঁড়ির একটু অংশ দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ি এখনও আগুনে পুড়ে যায়নি।

অজয় তার প্ল্যান ঠিক ক'রে নিলে, ওই দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে তেতালায় লীনার ঘরে পৌছাতে হবে। সে সামনের পুলিশটাকে জোরে এক ধাক্কা দিলে। হঠাৎ ধাক্কা

খেয়ে পুলিশটা রাস্তায় পড়ে গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে অজয় মরিয়ার মত বাড়ীর দরজার দিকে ছুটল। তারপর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ধোঁয়া, চারিদিকে ধোঁয়া, আগুনের হল্‌কা লাগছে, পাশে একটা দেয়াল ভেঙে পড়ল, — সিঁড়ির পর সিঁড়ি, সিঁড়ির পর সিঁড়ি — মাঝে মাঝে অজয়ের দম আটকে আসতে লাগল, কিন্তু সে থামলে না, লীনাকে বাঁচাতে হবে।

এদিকে অজয়কে পাগলের মত বাড়ীর মধ্যে ছুটে যেতে দেখে রাস্তায় খুব হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেল, লোকেরা সব বিস্ময়ে আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে লাগল। একটা পুলিশ অজয়ের পেছনে ছুটে এসেছিল কিন্তু অজয় নিমিষের মধ্যে বাড়ীর ভেতর অন্তর্হিত হয়েছে; পুলিশটা বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা ক'রে ধোঁয়া খেয়ে আগুনের হল্‌কা সইতে না পেরে বার হয়ে এল।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। পথের জনতা আরও বেড়ে উঠেছে, সবাই বিস্মিত ব্যথিত হয়ে ভাবছে, — কেন গেল ছেলেটি ওরকম ক'রে ছুটে, কাকে সে বাঁচাতে গেল? যতই সময় কাটতে লাগল সবাই ততই চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল, এদিকে আগুন আরও বেড়ে উঠেছে, বাড়ীর দরজাতে আগুনের শিখা পাগলের মত নৃত্য স্বুরু করেছে, ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, কিন্তু আগুন নেবাতে

পারছে না, আগুন-ভরা ঝড়ো-বাতাসে চারিদিক আকুল।

সহসা সমস্ত কোলাহল থেমে গেল, উত্তেজিত জনতা চুপ ক'রে তেতালার এক জানালার দিকে চাইলে, জানালা থেকে রঙীন ফুলের একটা টব সশব্দে নীচের ফুটপাথে পড়ল। সবাই শঙ্কিতভাবে দেখলে, অজয় একটি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা ছোট মেয়েকে কোলে করে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে — সিঁড়ি! সিঁড়ি! অজয়ের দীপ্ত মূর্ত্তি দেখে সবাই নিমেষের জন্য স্তব্ধ হয়েছিল, অজয়ের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শুনেই আবার সবাই সমুদ্র গর্জ্জনের মত চীৎকার ক'রে উঠল — সিঁড়ি! সিঁড়ি লাগাও শীগগীর — ওই, ওই জানলায় সিঁড়ি! ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের মত জনতা টলমল করতে লাগল।

ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা তাড়াতাড়ি তেতালার জানলায় সিঁড়ি লাগাল; ফায়ার ব্রিগেডের কর্ত্তা নিজে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছুটে গেলেন অজয়কে নামিয়ে আনতে। অজয় তাঁর হাতে তার বুক থেকে ছোট মেয়েটিকে দিয়ে বল্লে,— আগে লীনাকে ধরুন, লীনাকে!

সে ছোট মেয়েটি কিন্তু সত্যিসত্যি লীনা নয়, তার নাম হচ্ছে ভিকি। সে লীনার মত দেখতে ছিল, তাই অজয়ের মনে হয়েছিল সে লীনা। তার একটু অসুখ হয়েছিল, সে জন্য তার বাবা-মা তাকে সকালে বিছানাতে শুইয়ে জরুরী কাজে বাইরে গেছলেন; এদিকে বাড়ীতে আগুন লেগেছে।

ফায়ার ব্রিগেডের কর্ত্তা যখন ভিকিকে অজয়ের হাত হতে নিলেন, তখন অজয়ের পা কাঁপছে, সে শ্রান্ত, আগুনের হল্‌-কাতে তার হাত পা একটু ঝলসেও গেছে। ভিকিকে দিয়েই অজয় জানলা ধরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ; পথের নরনারীরা সে দৃশ্য দেখে মর্ম্মাহত হয়ে চেঁচাল, — ওকে বাঁচাও, বাঁচাও! ফায়ার ব্রিগেডের কর্ত্তা অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা ভিকিকে যখন তাঁর দলের আর একজনের হাতে দিয়ে জানালা দিয়ে ঘরে নামলেন, তখন ঘর ধোঁয়াতে ভরে গেছে। তিনি তাড়াতাড়ি অজয়কে পিঠে তুলে নিয়ে আবার সিঁড়িতে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যখন তিনি অজয়কে পথে এনে নামালেন তখন অজয়ের জ্ঞান একটু ফিরে এসেছে। এক ভদ্রলোক তাঁর ওপেল্ মোটরকার নিয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন, — আমি এ বীর বালককে হাস্পাতালে নিয়ে যাচ্ছি। অজয় মৃদু হেসে বল্লে, — হাস্পাতালে নয়, আমাকে “নয় রিট্‌স্” হোটেলে নিয়ে চলুন।

বার

কয়েক মাস কেটে গেছে। খৃষ্টমাস এসেছে। হামবুর্গে কাপ্তান মায়ারের বাড়ীতে খৃষ্টমাসের উৎসবে সবাই এসে জুটেছে।

সে দিন খৃষ্টমাস ইভ, বাইরে বরফ পড়েছে, পথ-ঘাট-মাঠ বাড়ীর ছাদ সব সাদায় সাদা, ঝড়ো কনকনে বাতাসে জুঁই ফুলের পাঁপড়ির মত বরফ ধূসর আকাশ থেকে সারাদিন ঝরে ঝরে পড়ছে।

অজয় আগে কখনও বরফ পড়া দেখেনি, জানলার ধারে বসে পেঁজা তুলোর মত বরফ ঝরা দেখতে তার বড় মজা লাগছিল। বাইরে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, জল রাখলে জমে যায়, কিন্তু ঘর বেশ গরম, বেশ আরামজনক। তার কারণ বাড়ীতে সেণ্ট্রাল হিটিং ছিল। ইংলণ্ডে শীতকালে ঘর গরম করতে লোকে সাধারণত ফায়ার-প্লেসে কাঠের আগুন জ্বালে, অবশ্য আগুনের ধোঁয়া ঘরে আসতে পারে না, দেওয়ালের ভিতর চিম্‌নী দিয়ে ধোঁয়া উপরে উঠে যায়; কিন্তু জার্ম্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শীতকালে ঘর গরম করবার ব্যবস্থা অন্য রকমের। বাড়ীগুলির একতালাটা সাধারণত মাটির তলায়; একতালায় একটি ছোট বয়লার আছে, বয়লারের ওপর জলের বড় ট্যাঙ্ক থেকে সরু পাইপ বার হয়ে

সমস্ত বাড়ীর ভেতর ছড়িয়ে ঘরগুলির মধ্য দিয়ে দেয়াল বেয়ে আবার ট্যাঙ্কে গিয়ে মিশেছে ; বয়লার জ্বালালে ট্যাঙ্ক থেকে গরম জল পাইপ দিয়ে বাড়ীর সব ঘর ঘুরে ঠাণ্ডা হয়ে আবার ট্যাঙ্কে আসে, ট্যাঙ্কে কিন্তু সারাক্ষণ জল গরম হচ্ছে, গরম জলের স্রোত এমনি ক'রে দেয়ালের পাইপ ধ'রে ঘরে ঘোরাতে ঘর বেশ গরম থাকে। এমনি ভাবে ঘর গরম করার নাম হচ্ছে সেণ্ট্রাল হিটিং।

অজয় গরম জলের পাইপের ধারটিতে বসে বন্ধ জানলার কাঁচ দিয়ে বরফ পড়া দেখছিল ; সামনে গির্জ্জাটা সাদা হয়ে গেছে, বরফ পড়া থেমে আসছে। গির্জ্জার সাদা চূড়োটা ঝক্‌ঝক্ করছে। অজয় ভাবছিল, কলকাতায় জ্যৈষ্ঠের দুপুরে যদি এই রকম বরফ পড়ত, তাহ'লে কি মজাই হ'ত। সহসা তার মুখে এসে কি লাগল, সে চোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠল, — উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। তারপর হাত দিয়ে মুখ ঝেড়ে দেখলে তার জামা বরফে ভরে গেছে, আর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লীনা খুব হাসছে।

— লীনা, পাজি মেয়ে! যাচ্ছি!—বলে অজয় লীনাকে ধরতে গেল, তার মুখ যেন অসাড় হয়ে গেছে। লীনা জোরে এক ছুট্ দিলে ; টোনি এক কোণ থেকে বার হয়ে বল্লে, — আহা অজয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক, দু'খানা কম্বল এনে দিচ্ছি! তারপর আর এক চাপ তুষার অজয়েয় মুখের দিকে ছুঁড়ে ছুটে পালাল।

— মজা দেখাচ্ছি !—ব'লে অজয় মুখ ঝাড়তে লাগল। লীনা বা টোনি কাউকে অজয় বাড়ীতে খুঁজে পেলে না। ফ্রাউ মায়ার বল্লেন, — কি অজয়, সবাই যে বাইরে খেলতে গেছে, তুমি যাওনি! তারপর তিনি হেসে অজয়ের কাছে এগিয়ে এসে বল্লেন, — বড় ঠাণ্ডা, নয় ? অজয়ের গাল তখন ঠাণ্ডায় চিন্‌চিন্ করছে, সেই গালের ওপর তিনি খানিকটা বরফ চেপে ধ'রে হেসে বল্লেন, — কেমন আরাম বল ত! বস্তুত সে বরফ টোনি ও লীনা কিছু আগে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে গেছে।

অজয় দীপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠল,—ফ্রাউ মায়ার, আপনিও! তারপর সে বেগে ছুটে বার হ'য়ে গেল ; ইচ্ছা, খুব খানিকটা বরফ এনে সবাইকে স্নান করিয়ে দেবে।

বাইরে তখন বরফ পড়া থেমেছে, ছেলেমেয়ের দল খুব বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি করছে ; দুই দল হয়েছে, তাদের মধ্যে বরফের গোলা তৈরী ক'রে যুদ্ধ হচ্ছে। অনেকক্ষণ বরফ ছুঁড়ে সবাই একটু ক্লান্ত হয়েছিল, তাদের সাজসজ্জা বরফে সাদা, মুখগুলি আগুনের মত দীপ্ত, জ্বালাময়।

অজয়কে দেখে সবার বরফ ছোঁড়ার উৎসাহ বেড়ে গেল, টোনির দল বড় বড় গোলা নিয়ে অজয়কে আক্রমণ করলে, আর তার বিপক্ষ দল অজয়কে রক্ষা করতে লাগল। সহসা এমন আক্রান্ত হ'য়ে অজয় মরিয়া হয়ে লড়তে লাগল, তার গোলার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারল না।

টোনির ওপর তার হ'ল রাগ, সে-ই ত লীনাকে নিয়ে ঘরে গিয়ে বরফ ছুঁড়ে সকালের আরামটা এমন মাটি করলে। সে টোনির দিকে বেগে আক্রমণ করতে ছুটে গেল, টোনি বুঝলে, অজয় সত্যি রেগে গেছে; ধরতে পারলে অজয় তাকে বরফের মধ্যে শুইয়ে ছাড়বে আর অজয়ের সঙ্গে সে জোরে পারবে না। সুতরাং প্রাণপণে সে ছুট্ দিলে। মাঠের শেষে একটি বড় গর্ত্ত ছিল, সেই গর্ত্ত বরফে ঢেকে সমতল জমি হ'য়ে গেছল, বরফ প'ড়ে কিছুতেই বোঝবার জো ছিল না যে ওদিকে একটা গর্ত্ত আছে। টোনি সেই গর্ত্তের দিকেই ছুটল। অজয় তখন প্রায় টোনিকে ধরে-ধরে, তখন টোনি ঝুপ ক'রে সেই গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেল আর অজয়ও তার গতির বেগ সামলাতে না পেরে টোনির পাশে গর্ত্তের ভিতর পড়ল; সবাই ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল,—এরা দু'জনে বরফের মধ্যে কোথাও ডুবে গেল না-কি! লীনা কেঁদে ফেল্লে।

গর্ত্তটা কিন্তু তেমন বেশী গভীর ছিল না। টোনি মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল; তার পা গর্ত্তের তলায়, তার বুক পর্য্যন্ত বরফ; সে হেসে বল্লে,—এবার অজয়, ওঠ গর্ত্ত থেকে! অজয়ের পা তখন কাঁপছে, হাত টলছে, সে টোনির হাত জোরে জড়িয়ে ধরল; তার বুক পর্য্যন্ত বরফের শুভ্র স্তূপ, এ ভার ঠেলে ওঠা অসম্ভব। অজয় লজ্জিত ভাবে চারদিক চাইলে। কয়েকটি ছেলে তাদের সাহায্য করতে আসছিল; টোনি

চেঁচিয়ে বল্লে,— কেউ আমাদের কাছে এস না, যে আসবে সে-ই গর্ত্তের মধ্যে এসে পড়বে, তাতে লাভ কিছু হবে না, তার চেয়ে শীগগীর একটা শক্ত দড়ি নিয়ে এস।

সবাই দড়ি আনতে ছুটল, লীনা ভীত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভয় করতে লাগল বুঝি টোনি আর অজয় বরফে ডুবে যায়।

টোনি লীনার দিকে চেয়ে হেসে বল্লে, — কি হয়েছে রে লীনা! লীনা কম্পিতকণ্ঠে বল্লে,— দাদা, তোমরা শীগগীর উঠে এস, আমার বড্ড ভয় করছে।

টোনি হেসে বল্লে, – যাঃ, ভয় কি? কেমন জব্দ অজয়, আর ছুটে আসবে আমার পিছনে!

অজয় বুঝল অমন রাগ ক'রে আক্রমণ করা তার ঠিক হয়নি। সে ব্যথিত স্বরে বল্লে,— ভাই, আমার দোষ হয়েছে, ক্ষমা কর।

টোনি তার হাত চেপে বল্লে,— খেলার সময় অমন রেগে উঠতে নেই, বুঝলে।

সেই গর্ত্তে দুই বন্ধুর আবার মিলন হ'ল।

খুব মোটা দুটো দড়ি এল। সবাই মিলে টোনি ও অজয়কে গর্ত্ত থেকে টেনে তুল্লে। দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি ক'রে হাসতে হাসতে চল্ল। লীনা তার চোখের জল মুছে হাসিমুখে তাদের সঙ্গে গেল।

অজয় ভেবেছিল, ব্যাপার শুনে ফ্রাউ মায়ার নিশ্চয় খুব রাগ করবেন, বক্‌বেন। বাড়ীতে ঢুকতে ফ্রাউ মায়ার কিন্তু তাদের দুজনকে বুকে জড়িয়ে খুব হাসলেন, অজয়কে বল্লেন,— কেমন অজয়, কেমন তুষার-স্নান হ'ল, আমি গালে একটু বরফ দিয়েছিলুম বলে ছেলের কি রাগ তখন, কেমন জব্দ।

অজয় নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে হেসে বল্লে,— ফ্রাউ মায়ার, আমার ত কোন কষ্ট হয়নি, খুব enjoy করেছি।

তুষার-খেলায় হাস্যে কৌতুকে সকালটি সুন্দরভাবে কেটে গেল, কিন্তু খৃষ্টমাস ইভের সন্ধ্যা কাটল আরও চমৎকার। এমন আনন্দকর সন্ধ্যা অজয়ের জীবনে খুব কমই এসেছে। সেদিন ড্রয়িংরুমে ছেলেমেয়েদের যাওয়া বারণ ছিল। ফ্রাউ মায়ার ও দাসী আনা সে ঘরে সারাদিন কি করছেন তা দেখতে লীনার মন ছট্‌ফট্‌ করছিল, কিন্তু দেখবার জো নেই, দরজা বন্ধ। বিকেলে যখন ড্রয়িংরুমের দরজা খুলে দেওয়া হ'ল, ছেলেমেয়েরা কলহাস্যে ঘরে ঢুকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল: তারা যেন কোন্ স্বপ্নপুরীতে এসেছে, এ রূপকথার মায়ালোক। ড্রয়িংরুমের মাঝে এক মস্ত দেবদারু গাছ, গাছটা প্রায় ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, তার শাখা প্রশাখাতে লাল নীল হলদে বাতি বসানো; মাঝে মাঝে জরির ঝালর ঝুলছে, রঙীন চীনে লণ্ঠন দুলছে, সবুজ বেগুনী লাল নীল কত রকমের কাচের বল টুং-টুং ক'রে বাজছে, আর

তাদের মধ্যে চকোলেট, খাবার ঝুলছে। বাইরে যখন সন্ধ্যে হয়ে এল, জানলার কাচে বরফ পড়তে লাগল, আর ঘরে দেবদারু গাছের রঙীন বাতিগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল, চীনা লণ্ঠনে রঙীন আলো ঝিলমিল করতে লাগল, জরির ঝালর সব ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠল, তখন ছেলেমেয়ের দল চেঁচামেচি থামিয়ে অবাক হয়ে চুপ করলে, অজয়ের মনে হ'তে লাগল এ যেন কোন্ স্বপ্ন!

খৃষ্টমাসের উৎসবে অনেকে কাপ্তান মায়ারের বাড়ী এসেছিলেন। লীনা ও টোনি তার পাড়ার কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু অজয় হচ্ছে তাদের পরম আদরের বিশেষ অতিথি। গাছের সামনে গদিওয়ালা বড় চেয়ারে তাকে বসতে দেওয়া হ'ল। সবাই সোফায় চেয়ারে স্থির হয়ে বসলেন।

খৃষ্টমাস ইভের উৎসব আরম্ভ হ'ল। বাইরে স্তব্ধ শুভ্র অন্ধকার, স্বপ্নের মত ঘরে সবুজ দেবদারু গাছের মধ্যে রঙীন বাতির সারির মৃদু আলো ঝিক্‌মিক্ ঝিল্‌মিল্ করছে; সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে। প্রথমে ফ্রাউ মায়ার পিয়ানো বাজিয়ে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত গাইলেন। তারপর পাড়ার পাদ্রীমহাশয় একটু প্রার্থনা করলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে যিশুখৃষ্ট জন্মেছিলেন তাঁর দরিদ্র জননীর কোলে, এক আস্তাবলের কোণে; পাপপূর্ণ পৃথিবীতে তিনি প্রেম ও শান্তির বাণী প্রচার

ক'রে আপন জীবন উৎসর্গ ক'রে গেছেন; সেই মহাপুরুষকে স্মরণ ক'রে সবাই তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর ছেলে-মেয়েদের আবৃত্তি হ'ল! লীনা তার মিষ্টি সুরে আধ-আধ স্বরে বলতে লাগল — ওগো দেবদারু গাছ, ওগো আলোভরা সবুজের রঙীন মায়া, তুমি কি সুন্দর! আজ বাইরে তুষারের স্তব্ধ শুভ্রতা আর ঘরের ভিতর তোমার আলোভরা দীপ্তমূর্ত্তি, তুমি কি সুন্দর!— অজয়ের বড় সুন্দর লাগল। আবৃত্তি শেষ হ'লে অজয় ব'লে উঠল,— ফ্রাউ মায়ার, আবৃত্তির প্রথম পুরস্কার লীনার প্রাপ্য, ও-ই সব চেয়ে সুন্দর বলেছে। লীনার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল। সবাই বল্লে, – নিশ্চয় লীনাকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে। লীনা তখন ধ'রে বসল, — অজয়, তোমাকে কিছু আবৃত্তি করতে হবে। অজয় বল্লে, — আমি বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে পারি, কিন্তু তা তোমরা কেউ বুঝবে না।

সবাই বল্লে, — তাতে কিছু আসে যায় না, তুমি বল।

অজয় আবৃত্তি করলে, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা। দ্বিজেন্দ্রলালের সুন্দর গানটি। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনলে, তারপর অজয় যখন গানের শেষ অংশ জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রে বল্লে, সবাই ব'লে উঠল, – কি সুন্দর কবিতা!

ছেলেমেয়েদের মন কিন্তু উস্‌খুস্ করছিল কখন সাণ্টা ক্লজ আসবে। সবাই বার বার দরজার দিকে চাইছিল। কারণ, সেই বুড়ো সাণ্টাই সব উপহার আনবে।

আবৃত্তি শেষ হতেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে সোরগোল সুরু হ'ল, — ওই সাণ্টা ক্লজ আসছে ! ড্রয়িংরুমের বড় দরজা খুলে লাল সাজ প'রে সাদা লম্বা দাড়ি দুলিয়ে পিঠে বড় থলি ঝুলিয়ে সাণ্টা ক্লজ অবশেষে হাজির হলেন। ছেলেমেয়েদের লাফালাফি চীৎকার হাস্যে করতালিতে ঘর ফেটে পড়ে আর কি ! সাণ্টা তাঁর উপহার-ভরা থলিটি ঘরের মধ্যে মেজেতে রেখে একখানা চেয়ারে বসলেন, যেন কত পরিশ্রান্ত।

একটি ছেলে হেসে বল্লে,— বুড়ো ! কতদূর থেকে আসছ ?

সাণ্টা তাঁর দাড়ি নেড়ে বল্লেন, — ও সে বহুদূর। উত্তর পোল থেকে, তুষার দেশ থেকে —

আর একজন বল্লে — তা তোমার গায়ে ত বরফ দেখছি না, লাল সাজ বেশ পরিষ্কার রয়েছে।

এমনি কিছুক্ষণ মামুলী পরিহাস কৌতুকের পর সাণ্টা ক্লজ চেয়ার থেকে উঠে বল্লেন, — আচ্ছা, তোমাদের জন্য নানা উপহার থলিতে রেখে গেলুম, দেখে শুনে নিও, আমি চল্লুম, আমায় আরও অনেক বাড়ী যেতে হবে।

ছেলেমেয়েদের দল ব'লে উঠল,— ধন্যবাদ, সাবধানে যেও, বড় বরফ পড়ছে আর আসছে বছর আসতে ভুলো না, দেরী করো না।

সাণ্টা ক্লজ ব'লে গেলেন, — সবাই লক্ষ্মী হয়ে সারা বছর থেকো, তাহলে আসব।

সাণ্টা ক্লজের লালমূর্ত্তি অন্তর্হিত হতেই সবাই উপহার-ভরা থলির দিকে ছুটে গেল। ফ্রাউ মায়ার বল্লেন,— সবাই চুপচাপ ব'সে থাক, আমি সবাইকে দিচ্ছি। তাঁর পেছনে কোথা থেকে রাইনহার্ড এসে হাজির হয়ে থলি থেকে সব উপহার-দ্রব্য বার করতে লাগল। বস্তুত সে-ই লাল সাজ পরে সাণ্টা ক্লজ হয়ে এসেছিল। অজয়ের তাই সন্দেহ হয়েছিল, সে লীনাকে সে কথা বলাতে লীনা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলে না। তারপর লীনার হাতে যখন একটা ছোট্ট এরোপ্লেন উপহাররূপে এল, সে ভাবতে লাগল এতক্ষণে সাণ্টা ক্লজ এরোপ্লেন চড়ে কতদূর গেছে !

অজয়ের সামনে এক মস্ত বড় কাগজের বাক্স রেখে রাইনহার্ড তার হাত ধ'রে করমর্দ্দন ক'রে বল্লে,— অজয়, আমার শুভ কামনা ও প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ কর। বাক্সের মধ্যে নিশ্চয় কোন বহু মূল্যবান উপহার আছে।

অজয় আনন্দে অধীর হয়ে বাক্সের দিকে চেয়ে রইল। টোনি এসে বাক্সটি খুল্লে, সে বাক্সের ভিতর আর একটি বাক্স বার হ'ল, বাক্সের পর বাক্স বার হচ্ছে, খালি বাক্স, জিনিষ কোথা ! অজয়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল ; নিশ্চয়ই কেউ তার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। রাইনহার্ড ! ওই রাইনহার্ডই তার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। শেষে একটি ছোট বাক্স বার হ'ল, তাতে কিছু বিলিতি খড় পোরা। অজয় তার ঠোঁট দাঁতে চেপে ধরলে,

কে তার সঙ্গে এ রকম ঠাট্টা! ফ্রাউ মায়ার এগিয়ে এলেন, বল্লেন,— ভাল ক'রে খোঁজ অজয়, নিশ্চয় বাক্সের মধ্যে কিছু আছে, কেউ কিছু না দিয়ে আজকের দিনে শুধু শুধু ওরকম ঠাট্টা করে না।

খড়ের গাদা থেকে টোনি একখানা চিঠি বার করলে, অজয় চিঠির দিকে চেয়েও দেখলে না। ফ্রাউ মায়ার চিঠিটি খুল্লেন, তাঁর মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল; তিনি অজয়কে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বল্লেন,— দেখ, দেখ অজয়, কি সুসংবাদ! তখন রাগে অজয়ের চোখে জল ভরে এসেছে। সবাই তাকে ঠাট্টা করছে!

ফ্রাউ মায়ার অজয়কে ধীরে বল্লেন,— বোকা ছেলে! শোন, এ চিঠি তোমায় কে লিখেছেন জান? তোমার ক্লারা-দিদি, বার্লিন থেকে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, বার্লিনে এরোপ্লেন চড়া শেখার যে বড় স্কুল আছে, সে স্কুলে তাঁর বাবা দুটি ফ্রি-স্কলারশিপ্ দিয়েছেন, তার একটি স্কলারশিপ্ তোমাকে দেওয়া হয়েছে, শুধু স্কুলের মাইনে নয়, বার্লিনে থাকবার খাবার খরচও তোমাকে দেওয়া হবে।...এর চেয়ে আর কি ভাল খৃষ্টমাস উপহার তুমি চাও?

অজয় আবেগের কণ্ঠে ব'লে উঠল,— সত্যি!

তার দু'চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল ঝরে পড়ল! ফ্রাউ মায়ারের চোখও ছলছল হয়ে এল; অজয় আবার তাঁদের

ছেড়ে যাবে। টোনি অজয়ের হাত ধ'রে বল্লে,— হার্টি কন্‌গ্রেচুলেসন্স। লীনা ব'লে উঠল,— অজয়, আমায় এরোপ্লেন ওড়ানো শেখাবে ?

সমস্ত সন্ধ্যাটা অজয়ের স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল।

ভাবছ,

ও এরোপ্লেন

ন্যাণের উপায়,

মি এরোপ্লেন

অজয়কুমারের চিঠি

"অজয়কুমারে"র পাঠক-পাঠিকা প্রিয় বন্ধুগণ,

প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বের কথা হবে, মণীন্দ্রলাল বার্লিনে বেড়াতে এসেছিলেন। আমার দিদিমার সঙ্গে তাঁর খুব জানা শোনা ছিল, সেজন্যে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ তখন রাগে অজুন এসেছিলেন। আমি তখন এরোপ্লেন চালান তাকে ঠাট্টা করছে! স্কুলে পড়ছি। কুরফুরষ্টেন-ডামের এক কাফেতে ফ্রাউ মায়ার অজত তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প করেছিলুম। আমার এ চিঠি তোমায় কেথা তাঁকে বলেছিলুম, — কি করে জাহাজে পালিয়ে ইয়োরোপে আসি। আমার কিশোর জীবনের নানা ঘটনা সাজিয়ে তিনি বেশ একটি গল্পের বই লিখেছেন দেখছি। তোমাদের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে গেলুম।

তারপর কত ঘটনা ঘটে গেছে। সেই কিশোর দুঃসাহসিক অজয়কুমারের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে; এই পৃথিবীরও পরিবর্ত্তন বড কম হয়নি। এক যুগ পরিবর্ত্তন, কালান্তর হয়ে গেছে। আমরা এক নূতন যুগের দিকে এগিয়ে চলেছি।

গত মহাযুদ্ধে আমি বিমান-বাহিনীতে এরোপ্লেন-চালানোর কাজে অনেক দিন নিযুক্ত ছিলুম। কিন্তু সহর-গ্রামের ওপর গিয়ে

বোমা ফেলে নগর গ্রাম ধ্বংস করতে, নর নারীদের বিদগ্ধ করতে ইচ্ছা করত না, আমি যাত্রী-বাহী বা ডাক-বাহী এরোপ্লেনের চালকের কাজ করতুম।

গত মহাযুদ্ধে এরোপ্লেনের লড়াই কি ভয়ঙ্করই না হয়েছিল। কত ঘরবাড়ী কত নগর-গ্রাম বোমার আগুনে পুড়েছে, কত সংসার ছারখার হয়ে গেছে, কত ছেলেমেয়েরা মরেছে। এরোপ্লেন থেকে আণবিক বোমা ফেলে জাপানে হিরোসিমা সহর নিশ্চিহ্ন করে আমেরিকা যুদ্ধে জয় লাভ করলে। ভবিষ্যৎ কালে এরোপ্লেনের যুদ্ধ আরও ভয়ঙ্কর হবে। কিন্তু এরোপ্লেন শুধু ধ্বংসের অস্ত্র নয়, এরোপ্লেন হচ্ছে মানব কল্যাণের উপায়, মানব-সভ্যতার উন্নতির সহায়; সেজন্য আমি এরোপ্লেন ভালবাসি।

এরোপ্লেনের সাহায্যে অনেক ভাল কাজ নানা দেশে হচ্ছে। শস্যক্ষেতে অনেক সময় পোকা ধরে, তাড়াতাড়ি না মেরে ফেলতে পারলে সে পোকা সমস্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে সব ফসল নষ্ট করে দেয়। আমেরিকাতে এরোপ্লেনের সাহায্যে পোকা মারবার বিষাক্ত ধুলো ছড়িয়ে শস্যক্ষেত রক্ষা করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় গভীর জঙ্গলে খুব মশার প্রতিপত্তি, সেখানে খুব ম্যালেরিয়া, জঙ্গল মানুষের বাসের অযোগ্য; সে-সব জঙ্গলে মশা মারবার বিষ এরোপ্লেন সাহায্যে ছড়িয়ে মশা মারা হচ্ছে।

কোন দূর গ্রামে কারুর অসুখ করল, কোন ওষুধ নেই,

ভাল ডাক্তার নেই, তাড়াতাড়ি এরোপ্লেনের সাহায্যে ডাক্তার আনিয়ে রোগীকে ভাল করা হয়েছে — এ রকম দৃষ্টান্ত ইয়োরোপে আমেরিকায় অনেক পাওয়া যায়।

মানুষের গমনাগমন এরোপ্লেনে কত দ্রুত হয়েছে, আরও দ্রুত হবে। এক দেশ থেকে আর এক দেশ, এক শহর থেকে আর এক শহর, নদী বন পাহাড় পার হয়ে এরেপ্লেনের সাহায্যে কত সহজে কত শীগগীর চিঠি, খবরের কাগজ পাঠান যাচ্ছে।

আমি এরোপ্লেন করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছি। কত নগর গ্রাম নদী সমুদ্র পর্ব্বত বনের ওপর আকাশ পথে পরিভ্রমণ করেছি — কখনও শ্যামল সুন্দর শস্যক্ষেত্র, কখনও ঘন নিবিড় ভয়ঙ্কর অরণ্য, কখনও তৃণহীন জলহীন পাণ্ডুর মরুভূমি মাইলের পর মাইল মহাতঙ্কের মত, কখনও শ্বেত তুষারাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গ মালা, কখনও শুভ্রমেঘলোকের ঘূর্ণাবর্ত্ত, কখনও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অতল সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস — একবার সাহারার মরুভূমি প্রান্তে এরোপ্লেন থেকে ভেঙে পড়ে জলাভাবে মৃতপ্রায় হয়েছিলুম, একবার উত্তর মেরু পথে এস্কিমোদের দেশে বরফের ঘরে বাস করেছি, একবার নেমে দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলের উপর দিশাহারা হয়ে অ্যামাজন নদীর ধারে রাত কাটাতে হয়েছিল — সে সব গল্প একদিন তোমাদের বলবো।

মণীন্দ্রলালের লেখা আমার গল্পটি পড়ে তোমরা হয়ত

ভাববে আমি কি ডানপিটে বা বীর দুঃসাহসিক ছিলুম। আমি সহজ সরল সাধারণ ছেলেই ছিলুম। তবে কোন বিপদে ভয় পাইনি, সাহস করে এগিয়ে গেছি। বিপদে ভয় পেলে, বুদ্ধি হারালে চলবে না, সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে, যেখানে লড়াই করা দরকার সেখানে লড়াই করতে হবে, তবেই জীবন-যুদ্ধে অজেয় হওয়া যায়। যে নূতন যুগ আমাদের সামনে, সেখানে কাপুরুষের স্থান নাই, সাহসী বুদ্ধিমান বীর যোদ্ধার দরকার, সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য মানব-কল্যাণের জন্য যে যুদ্ধ করবে। আমার জীবন-যুদ্ধে যা শিখেছি, সেই কথা বলে আজ তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

তোমাদের
অজয়কুমার